পঠন সেতু

ষষ্ঠ শ্রেণি

পরিবেশ
ও
বিজ্ঞান

পরিবেশ
ও
ইতিহাস

পরিবেশ
ও
ভূগোল

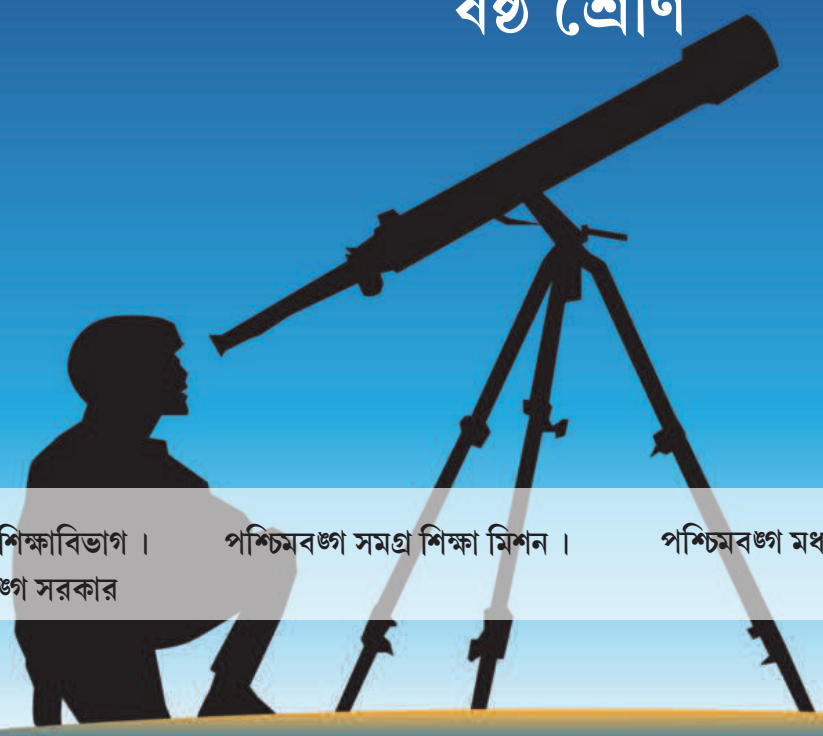

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন ।
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ।
বিশেষজ্ঞ কমিটি ।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পরিবেশ ও ইতিহাস

পরিবেশ ও ভূগোল

ষষ্ঠ শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্রিজ মেটিরিয়াল 'পঠন সেতু' প্রকাশিত হল। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নেবেন এবং 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই প্রত্যাশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০২১
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের জন্য 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে — এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

পঠন সেতু

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় নির্মাণ, সম্পাদনা ও বিন্যাস

ড. ধীমান বসু îo˜#œ ö‡y¡ রাজীব কুমার কর

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা	1
2.	আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ	8
3.	মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ	12
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	20
4.	মাপজোক বা পরিমাপ	21
5.	বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা	25
6.	মানুষের শরীর	34
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	40

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ওপর মানুষের নির্ভরতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরতা উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করতে পারবে।

উদ্ভিদের ওপর মানুষের নির্ভরতা

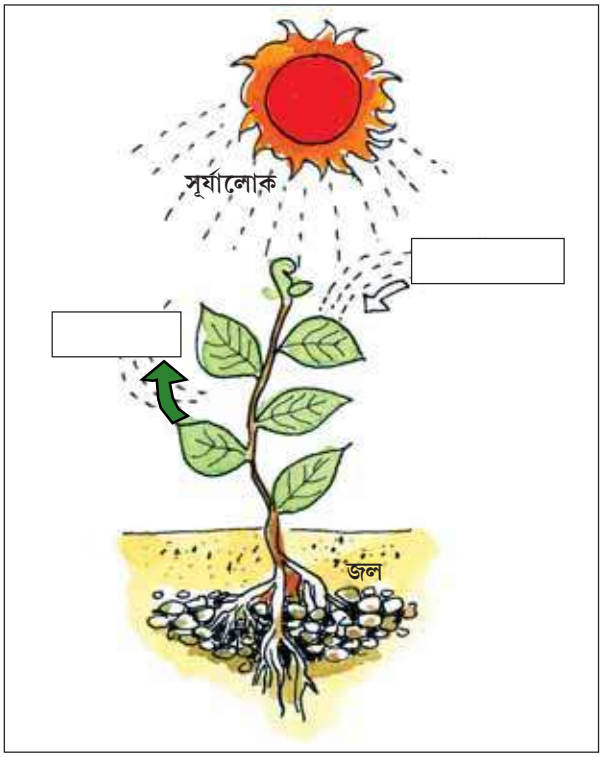

ওপরের ছবিতে ফাঁকা বাক্সে লেখো সবুজ উদ্ভিদ খাবার তৈরি করার সময় পরিবেশ থেকে কী গ্রহণ করে আর পরিবেশে কী ত্যাগ করে।

❖ **খাবারের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

- ♦ সূর্যের আলোর সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ তার শরীরের সবুজ অংশগুলোতে খাবার তৈরি করে। খাবার তৈরি করার জন্য মাটি থেকে জল আর বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। খাবার তৈরি করার সময় তৈরি হওয়া অক্সিজেন গ্যাস সবুজ উদ্ভিদ বাতাসে মিশিয়ে দেয়।
- ♦ তৈরি হওয়া খাবারের কিছুটা সবুজ উদ্ভিদ নিজে ব্যবহার করে। বাকিটা সবুজ উদ্ভিদ জমিয়ে রাখে নিজের শরীরে।
- ♦ আসলে সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির একটা অংশই উদ্ভিদের তৈরি খাবারে জমা থাকে। আর খাবার খেলে সেই শক্তিই আসে মানুষ আর অন্যান্য জীবের শরীরে। তারপর দরকার মতো সেই শক্তি মানুষ আর জীবরা ব্যবহার করে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে মানুষ আর অন্যান্য জীব তথা প্রাণীরা খাবারের জন্য সবুজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী শ্বাস নেওয়ার সময় অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে আর শ্বাস ছাড়ার সময় পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। সবুজ উদ্ভিদ খাবার তৈরি করার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করে।

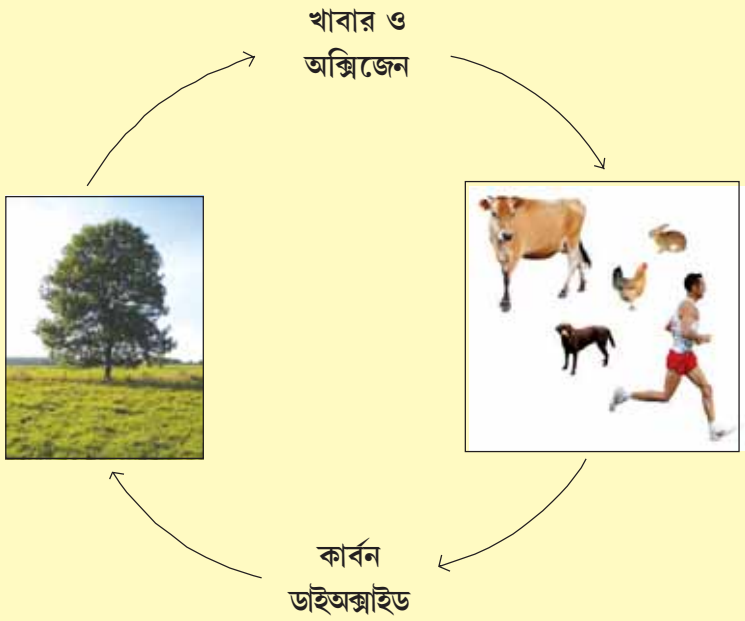

❖ **ওষুধের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

বিভিন্ন অসুখে প্রাথমিকভাবে কোন উদ্ভিদ ব্যবহার করা যেতে পারে নীচের সারণিতে লেখো।

কোন ধরনের অসুখ	কোন উদ্ভিদ ব্যবহার করা যেতে পারে
সর্দি-কাশি	
পেটের অসুখ	
শরীরের কোথাও কেটে গেলে	

তুলসী

- অসুখ হলে ডাক্তার দেখাতে যেতেই হবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ভেষজ উদ্ভিদের সাহায্যে ঘরোয়া চিকিৎসা করা যেতেই পারে। কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা থাকা জরুরি।
- গলা ব্যথা হলে বাসক পাতা, মিছরি, গোলমরিচ জলে ফুটিয়ে গরম জলটা খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- সর্দি-কাশিতে তুলসী ভালো কাজ করে।
- পেটের অসুখে থানকুনি পাতার রস কার্যকরী।
- শরীরের কোথাও কেটে গিয়ে বা ছড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে, দূর্বা থেতো করে সেই জায়গায় লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

থানকুনি

- সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন পাওয়া যায়। কুইনাইন থেকে ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি করা হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ওষুধের জন্য মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **জামাকাপড়ের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

কার্পাস গাছ

- কার্পাস গাছ থেকে তুলো পাওয়া যায়।
- তুলো থেকে সুতো তৈরি হয়। আর সুতো বুনে কাপড় তৈরি করা হয়।
- এখন অবশ্য কৃত্রিমভাবে তৈরি তন্তু থেকেও কাপড় তৈরি করা হয়। বড়ো বড়ো কারখানায় খনিজ তেল শোধন করে সিন্থেটিক সুতো তৈরি করা হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে জামাকাপড়ের জন্য মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **ঘরবাড়ি তৈরির সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র বা অন্যান্য সামগ্রী তৈরির জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

কাঠ কী কী কাজে লাগে নীচে লেখো।

কাঠ কী কী কাজে লাগে

কাঠের বাড়ি

চেয়ার-টেবিল

- অঞ্চল বিশেষে বাড়িঘর তৈরির উপাদান হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়।
- চেয়ার-টেবিল, খাট তৈরি করতে কাঠ কাজে লাগে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ঘরবাড়ি তৈরির সামগ্রী বা অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করার জন্য মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম—

মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে

- খাবারের জন্য
- ওষুধের জন্য
- জামাকাপড়ের জন্য
- ঘরবাড়ি তৈরির সামগ্রী বা অন্যান্য সামগ্রীর জন্য

প্রাণীদের ওপর মানুষের নির্ভরতা

❖ **খাবারের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভরতা**

- নানা পুষ্টিকর খাবার পাওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন পশু-পাখিকে পালন করে।

বিভিন্ন পালিত প্রাণীদের থেকে মানুষ কী কী পুষ্টিকর খাবার পায় তা নীচের সারণিতে লেখো।

পালিত প্রাণীর নাম	কী পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায়

মৌমাছিদের মৌচাক

দুধ সংগ্রহ

- হাঁস, মুরগি, মৌমাছি ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাণী থেকে মানুষ ডিম, মাংস, মধুর মতো পুষ্টিকর খাবার পায়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে খাবারের জন্য মানুষ প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **পরিবহণের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভরতা**

মানুষ পরিবহণের জন্য কোন কোন প্রাণীদের ব্যবহার করে লেখো।

মানুষ পরিবহণের জন্য যে যে প্রাণীদের ব্যবহার করে

গরুর গাড়ি

ঘোড়ার গাড়ি

- মানুষ পরিবহণের জন্য গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীদের ব্যবহার করে। যদিও বর্তমানে নানা কারণে পরিবহণের কাজে বিভিন্ন প্রাণীদের ব্যবহারের চল ক্রমশ কমে আসছে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে মানুষ পরিবহণের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **চাষের কাজের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভরতা**

- লাঙল দিয়ে জমি চষার খাটনি কমানোর জন্য একসময় মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর সাহায্য নিত।
- যদিও বর্তমানে চাষের কাজে প্রাণীদের জায়গা নিচ্ছে যন্ত্রপাতি।

বর্তমানে চাষের কাজে কেন নানারকম যন্ত্রপাতি প্রাণীদের জায়গা নিচ্ছে বলে তোমার মনে হয়? এতে কী সুবিধে?

1.

2.

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে মানুষ চাষের কাজের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **জামাকাপড়ের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভরতা**

কোন ধরনের জামাকাপড়ের উপাদান প্রাণীদের থেকে পাওয়া যায় তা নীচের সারণিতে লেখো।

জামাকাপড়ের নাম	জামাকাপড় তৈরির উপাদান যে প্রাণীর থেকে পাওয়া যায়

ভেড়া

পশমিনা ছাগল

- ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর লোম থেকে উল বা পশম পাওয়া যায়। উল দিয়ে শীতের সময় পরার জন্য সোয়েটার, জ্যাকেট ইত্যাদি তৈরি করা হয়।
- বর্তমানে অবশ্য গরম জামা তৈরি করার জন্য সিন্থেটিক বা কৃত্রিম উল বা ক্যাসমিলনও ব্যবহার করা হয়।

ভেবে দেখো : সিল্কের শার্ট বা শাড়ির কথা তোমরা জানো। সিল্ক কোথা থেকে পাওয়া যায়?

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে মানুষ জামাকাপড়ের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম—

মানুষ প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে

খাবারের জন্য | পরিবহণের জন্য | চাষের কাজের জন্য | জামাকাপড়ের জন্য

উদ্ভিদের ওপর প্রাণীদের নির্ভরতা

❖ **খাবারের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

♦ আলোচনার প্রথম অংশে আমরা জেনেছি যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা খাবারের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

নীচের সারণিতে তোমার পরিচিত কয়েকটি প্রাণীর নাম আর তারা কী খায় লেখো।

প্রাণীর নাম	কী খায়

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে প্রাণীরা খাবারের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

❖ **বাসস্থানের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরতা**

♦ বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রাণী উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

তোমার পরিচিত কয়েকটি প্রাণী আর বাসস্থানের জন্য উদ্ভিদের ওপর তারা কীভাবে নির্ভর করে তা নীচের সারণিতে লেখো।

প্রাণীর নাম	বাসস্থানের জন্য কীভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে

বাবুই পাখির বাসা

গাছের কোটরে কাঠবেড়ালী

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে বাসস্থানের জন্য প্রাণীরা উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম—

প্রাণীরা উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে

খাবারের জন্য | বাসস্থানের জন্য

আমরা উদ্ভিদ আর প্রাণীদের ওপর মানুষের নির্ভরতা এবং উদ্ভিদের ওপর প্রাণীদের নির্ভরতার কথা জানলাম। একইভাবে উদ্ভিদরাও কি প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে? এসো জেনে নেওয়া যাক।

প্রাণীদের ওপর উদ্ভিদের নির্ভরতা

- পাশের ছবি দুটোতে তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে মৌমাছি আর প্রজাপতি তাদের খাবার সংগ্রহ করে ফুল থেকে।
- তখন তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে ফুলের পরাগরেণু লেগে যায়।
- ওই মৌমাছি বা প্রজাপতিটি যখন অন্য কোনো ফুলে খাবারের সন্ধানে যায়, তখন তাদের গায়ে লেগে থাকা পরাগরেণু ওই ফুলে গিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটি হলো **পরাগমিলন**।
- নতুন উদ্ভিদ তৈরির জন্য পরাগমিলন অত্যন্ত জরুরি।

মৌমাছি

প্রজাপতি

ভেবে দেখো : পরাগমিলন ছাড়া আর অন্য কোনো কারণে কি উদ্ভিদরা প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে?

মনে রাখা জরুরি :

- মানুষ খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় এবং ঘরবাড়ি তৈরির উপাদান ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।
- মানুষ খাবার, পরিবহণ, চাষের কাজ এবং জামাকাপড়ের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।
- প্রাণীরা খাবার এবং বাসস্থানের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।
- উদ্ভিদ পরাগমিলনের জন্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

সবুজ উদ্ভিদ খাবার তৈরি করার সময় _____ গ্যাস পরিবেশে ত্যাগ করে।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ পরাগমিলনের প্রয়োজনীয়তা কী?

২.২ মানুষ নানা ধরনের প্রাণীদের পালন করে কেন?

৩. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

পরাগমিলন কী?

৪. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ প্রাণীরা কী কী কারণে উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে?

৪.২ সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে খাবার তৈরি করে?

2 আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরিবেশে সংঘটিত বিভিন্ন উভমুখী ও একমুখী ঘটনা, নিয়মিত ও অনিয়মিত ঘটনা চিহ্নিত করতে পারবে।
- দ্রুত ও মন্থর এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা চিহ্নিত করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ দিতে পারবে।
- ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।

তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে পদার্থের কথা জেনেছ। তোমরা জানো যে পদার্থমাত্রেই কিছু ভর আছে আর তা খানিকটা জায়গা দখল করে। পদার্থের তিনটে অবস্থার— কঠিন, তরল আর গ্যাসীয়—সম্বন্ধেও তোমরা কিছু কিছু কথা জেনেছ। জলের কঠিন, তরল আর গ্যাসীয় অবস্থাগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের কথাও তোমরা পড়েছ। তোমরা দেখেছ বরফ গলে জল হচ্ছে, জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে। শীতের সকালে শিশির জমে থাকতে দেখেছ, দেখেছ ভিজে জামা শুকিয়ে যেতে। এই সবই জলের অবস্থার পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ছাড়াও আরও কত পরিবর্তন তোমাদের চোখে পড়ে। কখনো ভেবেছ সেইসব পরিবর্তন কি নিয়মিতভাবে ঘটে, না অনিয়মিত? কোনো কোনো ঘটনা খুব ধীরে ঘটে আবার কোনোটা ঘটে দ্রুত তা কি তোমাদের চোখে পড়েছে? দিন-রাত্রির আসা-যাওয়া, গাছের পাতার রং বদলানো, মোমবাতির পুড়ে যাওয়া এমন কত কী পরিবর্তন তোমাদের চোখে পড়ে। আজ আমরা সেইসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

একমুখী আর উভমুখী ঘটনা

তোমাদের চেনা পরিবেশে অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো ঘটার পরে যে অবস্থা পাওয়া যায় সেখান থেকে আর উলটোদিকে ফিরে আসা যায় না। যেমন ধরো একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালে পাওয়া যায় কিছুটা ছাই আর কিছুটা ধোঁয়া। কিন্তু সেখান থেকে কি আর দেশলাইয়ের দাহ্য পদার্থটুকু ফিরে পাওয়া যায়? তোমরা বলবে 'না, যায় না তো!' ঠিকই, ঐ ছাই আর ধোঁয়া হলো এমন জিনিস যা থেকে প্রাথমিক অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে একমুখী পরিবর্তন। এইরকম আরও দুটো একমুখী পরিবর্তনের কথা তোমাদের বলা হলো : বয়স হলে মানুষের যে চুল পেকে সাদা হয়ে যায়, তা কি আর আগের মতো কালো রঙে ফিরে আসে? কিংবা ধরো শীতকালে গাছের যে পাতা শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেছে তা কি আবার সবুজ হয়ে ওঠে?

এবার আসি উভমুখী ঘটনার কথায়। নাম শুনে বুঝতেই পারছ যে এই ধরনের পরিবর্তন একমুখীর ঠিক উলটো : এখানে পরিবর্তন হবার পরে আবার তা প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। যেমন ধরো লোহাকে উনুনে খুব গরম করলে তা একসময় টকটকে লাল রঙের হয়ে যায়, কিন্তু ঠান্ডা করলে সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ফুটন্ত জল থেকে যে বাষ্প হলো তাকে ঠান্ডা করলে আবার জল পাওয়া যায়। বরফ গলে যে জল হলো তাকে ডিপ ফ্রিজে রাখলে একসময় তা আবার বরফে পরিণত হয়।

নীচের সারণির ঘটনাগুলো একমুখী না উভমুখী তা লেখো :

ঘটনা	একমুখী না উভমুখী
১. কাঁচা আম পেকে হলুদ হয়ে যাওয়া	
২. কাগজ পুড়ে যাওয়া	
৩. মোমকে গলিয়ে ফেলা	
৪. মাখন গলিয়ে ফেলা	

পর্যাবৃত্ত ও অপর্যাবৃত্ত ঘটনা

এমন অনেক ঘটনা আছে যা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবার ঘটে। যেমন ধরো দিন থেকে রাত হয়ে আবার দিন হওয়া, নদীতে জোয়ার আসা এইসব। এগুলো হলো পর্যাবৃত্ত ঘটনা। সব ঘটনাই কিন্তু পর্যাবৃত্ত নয় : এই যেমন ধরো হঠাৎ করে প্রবল বন্যা, কিংবা ঘূর্ণিঝড় হওয়া তো আর সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে ঘটে না। এই যেসব ঘটনা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বারবার ঘটে না তাদের বলা হয় অপর্যাবৃত্ত ঘটনা।

নীচের সারণিতে উল্লেখ করা ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনটা পর্যাবৃত্ত আর কোনটা অপর্যাবৃত্ত তা লেখো :

ঘটনা	পর্যাবৃত্ত না অপর্যাবৃত্ত
১. ভূমিকম্প	
২. সুনামি	
৩. ঋতু পরিবর্তন	
৪. চাঁদের দৃশ্য অংশের আকৃতি পরিবর্তন	

যে ঘটনা প্রাকৃতিক আর যা মানুষের সৃষ্টি

প্রকৃতিতে যা নিজেই ঘটে, তাই হলো প্রাকৃতিক ঘটনা। ওপরের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে চারটে প্রাকৃতিক ঘটনা — এগুলো হল ভূমিকম্প, সুনামি, ঋতু পরিবর্তন আর চাঁদের দৃশ্য অংশের আকৃতি পরিবর্তন। কিন্তু বনের গাছ কেটে ফেলা, প্লাস্টিক পোড়ানোয় পরিবেশ দূষণ ঘটা কিংবা কীটনাশক দেওয়ায় পোকার মৃত্যু—এগুলোর কোনোটা কি প্রাকৃতিক ঘটনা? এ তো মানুষের কাজের ফলে ঘটছে। পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হড়পা বান আসা, আর বাঁধ বাঁচাতে জল ছাড়ার ফলে বন্যা—এ দুটোর মধ্যে কোনটা প্রাকৃতিক আর কোনটা মানুষের সৃষ্টি বলো তো।

মন্থর ও দ্রুত ঘটনা

তোমরা জানো যে গাছের অবশেষ বহু কোটি বছর ধরে মাটির নীচের তাপ আর চাপে থাকতে থাকতে কয়লায় পরিণত হয়। যে ব্যাপারটা ঘটতে কোটি কোটি বছর সময় লাগে তা নিশ্চয়ই ধীর গতির পরিবর্তনের ফলেই ঘটছে। এই ধরনের ঘটনা হল মন্থর ঘটনা। একটা লোহার তৈরি বস্তুকে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ফেলে রাখলে চার-পাঁচদিন পরে দেখা যায় যে তাতে লালচে-বাদামি রঙের মরচে ধরেছে। তাহলে ওই কয়লা তৈরি হওয়ার তুলনায় এই মরচে ধরার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দ্রুত ঘটনা, তাই নয় কি?

এইখানে কিন্তু একটা দরকারি কথা আছে : ধীর গতির পরিবর্তন আর দ্রুত পরিবর্তনের তফাত তো হল সময়ের। এই ব্যাপারটা কিন্তু আপেক্ষিক, মানে তুলনার ভিত্তিতেই হয়। যেমন ধরো আমাদের দেহে নানান পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে কোনো কোনোটা ঘটতে এক বা দু সেকেন্ড মাত্র সময় লাগে। তাহলে ওই লোহার মরচে ধরার চেয়ে সেই পরিবর্তন দ্রুততর, তাই নয় কি? আরও একটা দরকারি কথা বলা যাক। অনেক রাসায়নিক পরিবর্তন আছে যা কম উষ্ণতায় ঘটে ধীরে ধীরে, কিন্তু বেশি উষ্ণতায় ঘটে দ্রুত। এখানে উষ্ণতা হল সেই শর্ত যার পরিবর্তন করলে সামগ্রিক পরিবর্তন আরও দ্রুত ঘটা সম্ভব হয়। আবার কোনো কোনো সময়ে বড়ো আকারের কঠিন বস্তুর চেয়ে তার ছোটো টুকরো বা গুঁড়োর সেদ্ধ হওয়া বা পুড়ে যাওয়া ঘটে অনেক তাড়াতাড়ি। যেমন ধরো মশা তাড়াতে যে ধুনো দেওয়া হয় তা যদি মিহি করে গুঁড়িয়ে রাখা হয় তবে তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে; কিন্তু ধুনোর বড়ো ডেলা অত তাড়াতাড়ি পোড়ে না। কেন এমন হয়? কোনো কঠিন যখন পোড়ে, তখন প্রাথমিকভাবে পরিবর্তনটা ঘটে তার উপরিতল থেকে। এখন উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে, তত তাড়াতাড়ি পরিবর্তনটা ঘটতে পারবে। কঠিনের বড়ো টুকরোকে ভেঙে

গুঁড়ো করে ফেললে তার উপরের তলের ক্ষেত্রফল অনেক বেড়ে যায়। তাই গুঁড়ো করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে দ্রুত।

এই বিষয়টা বুঝতে নীচের পরীক্ষাটা করো — একটা চককে ক্রমশ ভাঙতে থাকো। কী দেখবে? তুমি দেখবে যে চকের উপরিতলে অনেক জায়গা দেখা যাচ্ছে, যা আগে দেখা যাচ্ছিল না। তাই আমরা বলতে পারি যে বড়ো চকটাকে ভাঙবার ফলে টুকরোগুলোর উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে গেছে। ছবিতে এই বেড়ে যাওয়া ক্ষেত্রফলকে ◯ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।

এই ক্ষেত্রফল বেড়ে যাবার কারণেই আলুর বড়ো টুকরোর চেয়ে ছোটো ছোটো টুকরো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। এর কারণ হলো সামগ্রিকভাবে ক্ষেত্রফল বেড়ে যাওয়ায় ছোটো টুকরোগুলোয় আরও তাড়াতাড়ি তাপ ঢুকতে পারে।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

ভৌত পরিবর্তনের ফলে সাধারণত প্রাপ্ত পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে মূল পদার্থে ফিরে যাওয়া যায়। তোমার চেনা তিনটে ভৌত পরিবর্তন হলো বরফ গলে যাওয়া, কর্পূর উবে যাওয়া, জলের বাষ্প হওয়া। রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে সহজে মূল পদার্থে ফিরে যাওয়া যায় না। লোহায় মরচে ধরা, কাগজ পুড়ে যাওয়া, পোড়াচুনে জল দিয়ে কলিচুন তৈরি হলো রাসায়নিক পরিবর্তন।

নীচের সারণিতে ভৌত আর রাসায়নিক পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত তুলনা করা হলো :

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
i. জল থেকে বাষ্প হলে জলের উভমুখী পরিবর্তন হয় ।	i. লোহা থেকে মরচে হয়ে গেলে, লোহার একমুখী পরিবর্তন হয়ে যায়।
ii. জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করলে আবার জল ফিরে পাওয়া যায়।	ii. অক্সিজেন আর জল সরিয়ে নিলেও মরচে থেকে আর সহজে লোহায় ফেরত যাওয়া যায় না।
iii. ভৌত পরিবর্তন সাধারণত উভমুখী ঘটনা।	iv. রাসায়নিক পরিবর্তন সাধারণত একমুখী ঘটনা।
iv. পদার্থের মূল গঠন অপরিবর্তিত থাকে।	v. মূল গঠন পরিবর্তিত হয়।

কী থেকে অনুমান করা যায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে?

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে ভাবতে পারি কোনো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে। কোনো পরিবর্তনের সময় যদি নীচের এক বা একাধিক পর্যবেক্ষণ থাকে তা হলে প্রাথমিকভাবে মনে করা যেতে পারে যে সেটি রাসায়নিক পরিবর্তন, তবে নিশ্চিত হতে হলে বিস্তৃততর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি : **(ক)** কোনো পদার্থ থিতিয়ে পড়ে অর্থাৎ অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়, অথবা **(খ)** কোনো গ্যাস উৎপন্ন হয়, অথবা **(গ)** গন্ধ বা বর্ণের পরিবর্তন হয়, অথবা **(ঘ)** তাপ মুক্ত বা শোষিত হয় তাহলে বলা যেতে পারে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। কোনো কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় আলো ও শব্দও উৎপন্ন হয়।

এসো এবারে কিছু খুব চেনা রাসায়নিক পরিবর্তনের বিষয়ে জানার চেষ্টা করি :

রাসায়নিক ঘটনা	কী থেকে পরিবর্তনটা বোঝা যায়
লোহায় মরচে ধরা	লোহার ওপরে লালচে-বাদামি রঙের ছোপ পড়া।
কাগজ পুড়ে যাওয়া	ছাই ও ধোঁয়া তৈরি হওয়া, বিশেষ গন্ধ বেরোনো, আলো আর তাপ উৎপন্ন হওয়া।
পোড়াচুনে জল দিয়ে কলিচুন তৈরি	জলের নীচে কাদার মতো পদার্থ (কলিচুন) জমা হওয়া, প্রচুর তাপ উৎপন্ন হওয়া।
কাঁসার বাসনে ছোপ ধরা	হলুদ রঙের কাঁসার বাসনে জায়গায় জায়গায় সবুজ ছোপ ধরা।
হলুদ-মাখা হাতে সাবান দেওয়া	হলুদ রং বদলে লালচে-কমলা হয়ে যাওয়া।

ওপরে যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা বলা হলো সেসব অপেক্ষাকৃত সরল রাসায়নিক পরিবর্তন। তোমরা কিন্তু অনেক জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গেও পরিচিত। দেখো তো এসব ঘটনার কথা তোমরা জানো কি না : দুধ থেকে দই তৈরি, গাছের পাতার রং পালটে যাওয়া, খাবার পচে যাওয়া, সিমেন্ট জমাট বাঁধা, কাঁচা ফল পেকে যাওয়া। এগুলোয় একাধিক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। আর একটা খুব জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন হলো সালোকসংশ্লেষ।

দহন আর তার প্রয়োগ

আগুন ধরে পুড়ে যাওয়াকে বলে দহন। যেকোনো জ্বালানির দহন হলো অক্সিজেনের সঙ্গে জ্বালানির রাসায়নিক বিক্রিয়া। দহন হলে যে তাপ নির্গত হয় তার সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানান দরকারি কাজ করতে পারি। যেমন ধরো গ্যাসের উনুনে গ্যাস পুড়ে যে তাপ নির্গত হয় তা দিয়ে আমরা সরাসরি জল ফুটিয়ে ভাত রান্না করি, রুটি সেঁকে নিই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগে, তবে তা সরাসরি তাপ থেকেই বিদ্যুতে নয়। এখানে কয়লা পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন তাপ দিয়ে জল ফোটানো হয়। জল ফুটিয়ে যে বাষ্প পাওয়া যায় সেই গরম বাষ্পের প্রবল চাপে টারবাইনের পাখাকে ঘোরানো হয়। টারবাইনের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করা থাকে যে টারবাইনের পাখা ঘুরলেই বিদ্যুৎ তৈরি হবে।

মনে রাখা জরুরি :

- কঠিন পদার্থকে গুঁড়ো করে রাখলে তার উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। তখন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাড়তাড়ি।
- তোমাদের চেনা অনেক পরিবর্তন আসলে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি, অর্থাৎ জটিল পরিবর্তন, যেমন ধরো দুধ থেকে দই হওয়া, খাবার পচে যাওয়া, সালোকসংশ্লেষ, গাছের পাতার রং বদলানো ইত্যাদি।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির 'আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ যে পরিবর্তনটি রাসায়নিক পরিবর্তন তা হলো—

(ক) জল ফুটে বাষ্প হওয়া (খ) মোম গলে যাওয়া (গ) কর্পূর উবে যাওয়া (ঘ) লোহায় মরচে ধরা

২. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ রাসায়নিক পরিবর্তনের তিনটি উদাহরণ দাও।

২.২ বড়ো ডেলার চেয়ে গুঁড়ো ধুনো তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে কেন?

২.৩ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা থেকে কী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়?

২.৪ কোনো একটা পরিবর্তন যে রাসায়নিক পরিবর্তন হতে পারে তা কী করে বুঝবে?

3 মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ

তোমরা বিষয়টি পড়ার পরে :

- ধাতু ও অধাতুর বিভিন্ন ভৌত ধর্মের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
- বিশুদ্ধ পদার্থ ও মিশ্রণের উদাহরণ উল্লেখ করতে পারবে।
- মৌল ও যৌগের গঠনগত একক রূপে পরমাণু ও অণুর ধারণা গঠন করতে পারবে।
- মৌলদের নামের সঙ্গে চিহ্নের সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।
- উপাদান মৌলের চিহ্ন ব্যবহার করে কিছু সরল সমযোজী যৌগের নাম ও সংকেত লিখতে পারবে।

কোনো পদার্থের 'ধর্ম' বলতে তার নানান বৈশিষ্ট্যের কথা বোঝানো হয়। তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে পদার্থের কঠিন, তরল আর গ্যাসীয় অবস্থায় কিছু কিছু ধর্মের কথা জেনেছ। এসো সেই কথাগুলোকে আমরা আবার একটু দেখি।

অবস্থা	ধর্ম
কঠিন	ভর আছে। নিজস্ব আকার ও আয়তন আছে। নিজে থেকে ছড়িয়ে পড়ে না।
তরল	ভর আছে। নিজস্ব আয়তন থাকলেও নিজস্ব আকৃতি নেই। ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আছে।
গ্যাস	ভর আছে। নিজস্ব আয়তন বা আকৃতি কোনোটাই নেই। ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যে পাত্রে রাখা হোক তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এখন আমরা তোমাদের বিভিন্ন রকমের কঠিন পদার্থের আরও কিছু ধর্মের কথা বলব। এই ধর্মগুলো হল তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা, তড়িৎ পরিবহণ করার ক্ষমতা, নমনীয়তা আর প্রসারণশীলতা।

রান্নাঘরে মা হাঁড়িতে ভাত রান্না করেন, কড়ায় মাছ ভাজেন, বড়ো বাটিতে সবজি সিদ্ধ করেন, তাওয়ায় রুটি সেঁকেন। এই পাত্রগুলো কী দিয়ে তৈরি— ধাতু, প্লাস্টিক না কাচ? তোমরা বলবে এগুলো হয় লোহা নয়তো অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। **অ্যালুমিনিয়াম আর লোহা হলো ধাতু; সোনা, পিতল, কাঁসা আর তামাও আরও চারটে ধাতুর উদাহরণ।** এদের প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে তাপ খুব সহজেই যেতে পারে। প্রত্যেকটাই বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। প্রত্যেকটাই চকচকে করে তোলা যায়। ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় বলেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কখনোই লোহার চেয়ার, টুল বা মইতে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিকের লাইনের কাজ করেন না। আবার রান্নার বাসনের মধ্যে দিয়ে তাপ ভালোভাবে যেতে না পারলে রান্না তাড়াতাড়ি করা যেত কি? সেই কাজেই তাই ধাতুই চাই। **কাচ, চিনেমাটি, প্লাস্টিক, কাঠ, রাবার এসব হলো অধাতু।** এদের কোনোটাই তাপ আর তড়িতের সুপরিবাহী নয়। দেখা যাচ্ছে আমাদের চেনা নানান ধরনের পদার্থের কিছু ধর্মের সাহায্যে তাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, ধাতু আর অধাতু।

ধাতু আর অধাতুর ধর্মে কী কী পার্থক্য থাকে

ধাতু	অধাতু
1. ধাতুর মধ্যে দিয়ে তাপ ও তড়িৎ সহজেই যেতে পারে। তাই এদের বলা হয় তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।	1. সাধারণত অধাতুর মধ্যে দিয়ে তাপ আর তড়িৎ ভালোভাবে যেতে পারে না, অর্থাৎ তাপ ও তড়িতের কুপরিবাহী।
2. ধাতুকে টেনে লম্বা তারের আকৃতি দেওয়া যায়।	2. সাধারণত অধাতুরা ধাতুর মতো প্রসারণশীল নয়।
3. ধাতুকে পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়।	3. অধাতুকে আঘাত করলে সাধারণত তা ভেঙে যায়।
4. ধাতুকে আঘাত করলে 'ঠং' করে শব্দ হয়।	4. অধাতুকে আঘাত করলে এইরকম শব্দ শোনা যায় না।

ওপরে তোমাদের যেসব কথা বলা হলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে। যেমন ধরো হিরে অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী; গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপ এবং তড়িতের সুপরিবাহী। ধাতু হলেও সাধারণ উষ্ণতায় পারদ কঠিন নয়, তরল।

করে দেখো

(1) দু-টুকরো তামার তার, দুটো ছোটো পেরেক, একটা ব্যাটারি ও একটা ছোটো হোল্ডারসহ বালব ছবির মতো করে তাদের জোড়া লাগাও। এবার একটা পেরেক খুলে নাও ও তার জায়গায় একটা সরু লম্বা কাঠকয়লার টুকরো ছবির মতো করে জোড়া লাগাও। কোন ক্ষেত্রে বাল্ব জ্বলছে আর কোন ক্ষেত্রে বাল্ব জ্বলছে না?

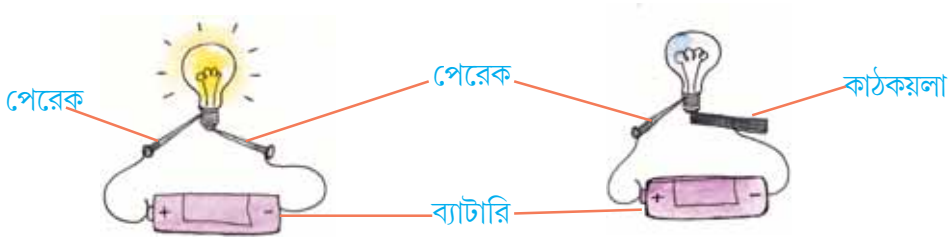

কাঠকয়লা লাগালে বাল্ব জ্বলে না কিন্তু লোহার পেরেক লাগালে বালবটা জ্বলে। কেন এমন হলো?

লোহার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় তাই বালব জ্বলছিল। কাঠকয়লার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় না তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বালবটা জ্বলেনি।

ধাতু আর অধাতুদের নানান ধর্ম সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা হলো তা থেকে নীচের সারণি পূরণ করো :

কী বস্তু	কীসের তৈরি	পদার্থটা ধাতু না অধাতু	তার কোন ধর্ম কাজে লাগানো হলো
1. রান্নার প্রেসার কুকার	অ্যালুমিনিয়াম		
2. ইলেকট্রিকের তার	তামা		
3. প্রেসার কুকারের হাতল	প্লাস্টিক		
4. ইলেকট্রিকের সুইচের ঢাকনা	প্লাস্টিক		
5. ইলেকট্রিক তারের আস্তরণ	রাবার/প্লাস্টিক		

বিশুদ্ধ ও মিশ্র পদার্থ

চতুর্থ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে হাওয়া হলো এক রকমের গ্যাসীয় মিশ্রণ। হাওয়াতে থাকে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প। আবার দেখো ঠান্ডা পানীয়, চিনির শরবত, মধু এসবে একাধিক রকমের জিনিস থাকে। এরাও তাই মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণ।

আবার দেখো, নানান ধাতুকে নানানভাবে শোধন করে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যে তাতে প্রায় কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ (অশুদ্ধি) মিশে নেই। সেইরকম অবস্থাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ ধাতু। শুধু ধাতু নয়, আমাদের চেনা আরও অনেক পদার্থকেই যেমন জল, চিনি, গ্লুকোজ, অক্সিজেন গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এসবকেও নানান উপায়ে শোধন করে কার্যত বিশুদ্ধ করে নেওয়া যায়।

মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ

বিশুদ্ধ পদার্থ আবার দু-রকমের হতে পারে—মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের ধারণা পেতে হলে নীচের কথাগুলো একটু পড়ে দেখো। তোমরা জানো যে বড়ো জিনিসকে ভাঙলে ছোটো ছোটো টুকরো পাওয়া যায়।

নীচের ছবি তিনটে দেখো ঃ তিনটে বোতলেই একই লোহার টুকরো আছে।

A

B

C

ছবি থেকে দেখো 'C' বোতলের লোহার টুকরোগুলোই সবচেয়ে ছোটো, আর তাদের একটা একটা করে গোনা আর আলাদা করে চিনতে পারা বেশ শক্ত। যদি 'C' বোতলের লোহার টুকরোগুলো আরও ছোটো করে প্রায় ধুলোর মতো মিহি করে ফেলো, তবুও তারা লোহাই থাকবে। লোহাই যে থাকবে তার প্রমাণ হলো এই যে বড়ো টুকরোগুলো যেমন জলে-হাওয়াতে ফেলে রাখলে মরচে ধরে, তেমনি ছোটো ছোটো টুকরো বা মিহি গুঁড়োতেও মরচে ধরবে। এর মানে হলো লোহার ধর্মের পরিবর্তন হয়নি।

গত প্রায় দুশো বছর ধরে বিজ্ঞানীদের নানান পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে মানুষ আজ জেনেছে যে লোহা, তামা, সোনা, রুপো, অ্যালুমিনিয়াম এসবই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কণা দিয়ে তৈরি। এইসব কণাদের চোখে দেখা যায় না, তবে এদের অস্তিত্বের নানান প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেইসব প্রমাণের কথা তোমরা পরে জানবে। এই কণাদের বলে অ্যাটম (atom) বা পরমাণু। চোখে দেখার মতো এক কুচি লোহা বা সোনায় বহু লক্ষ কোটি পরমাণু থাকে। বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুর ভর বিভিন্ন হয়। লোহা, তামা, সোনা, রুপো, অ্যালুমিনিয়াম এসব ধাতুকে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না। এদের তাই বলে মৌলিক পদার্থ বা মৌল (ইংরেজিতে এলিমেন্ট, element)। 'এলিমেন্ট' কথার একটা মানে হলো কোনো কিছুর একদম গোড়ার কথা, যা না জানলে সেই বিষয়টার বাকিটুকু ভালোভাবে জানা যাবে না। তাই মৌল বা এলিমেন্টরা হলো পদার্থের প্রাথমিক বা সরলতম অংশ, যাদের পরমাণু দিয়ে আমাদের চারপাশের নানান চেনা যৌগিক পদার্থ—নুন, চিনি, জল, চুন, গ্লুকোজ, ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। প্রকৃতিতে এ পর্যন্ত 94টি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। **মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম দেখাতে পারে তাকেই মৌলিক পদার্থের পরমাণু (atom) বলা হয়। কিন্তু পরমাণুকে আরো ভাঙলে তার মধ্যে মৌলের গুণগুলো আর বজায় থাকবে না।**

একাধিক রকমের মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ (compound) **তৈরি হয়। একাধিক মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরি হলে যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মগুলো মৌলিক পদার্থগুলোর ধর্ম থেকে বদলে যায়।**

করে দেখো

একটা বিকারে কিছুটা পানীয় জল নাও। একটা রবারের টুকরোর মধ্যে দুটো ছোটো পেরেক পুঁতে পাশের ছবির মতো জলের মধ্যে ডোবাও। তিন-চারটে টর্চ জ্বালানোর সাধারণ ব্যাটারির সঙ্গে কুপরিবাহী পদার্থের আস্তরণ দেওয়া (অন্তরিত) তামার তার যোগ করে ওই জলের মধ্যে ডোবানো দুটো পেরেকের মাথায় যোগ করো। পেরেক দুটোর গায়ে কী ঘটছে তা ভালো করে লক্ষ করো।

সতর্কতা : সাধারণ টর্চের ব্যাটারির সাহায্যেই শুধু এই পরীক্ষা করবে। বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন বা ইনভার্টারের লাইন থেকে কখনোই করবে না।

ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে পেরেক দুটোর গায়ে বুদবুদের মতো গ্যাস জমা হচ্ছে। পেরেক দুটোর একটার গায়ে হাইড্রোজেন আর অন্যটার গায়ে অক্সিজেন গ্যাস জমা হচ্ছে। কেন বলোতো?

তড়িৎ পাঠালে জল ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে। হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস। আবার অক্সিজেন দহনে সাহায্য করে, কোনো কিছু পুড়তে অক্সিজেন অপরিহার্য। কিন্তু জল তৈরি হবার সময় অক্সিজেন এমনভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে জোট বেঁধেছে যাতে জোট বাঁধার পর দুটো গ্যাসেরই নিজের ধর্ম লোপ পেয়েছে — জল দাহ্য নয়, আর আগুন জ্বলতেও সাহায্য করে না।

নীচের সারণিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ধর্মের সঙ্গে জলের ধর্মের তুলনা করা হলো :

হাইড্রোজেনের ধর্ম	অক্সিজেনের ধর্ম	জলের ধর্ম
হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ আর বাতাসের চেয়ে হালকা।	অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ, বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী।	বর্ণহীন, গন্ধহীন, সাধারণ অবস্থায় তরল।
অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জ্বলে।	অক্সিজেন কোনো কিছুকে জ্বলতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজে জ্বলে না।	কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে না।

পরীক্ষায় বোঝা যায় যে জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পারেনি। অর্থাৎ জলের রাসায়নিক ধর্ম তার উপাদানগুলোর ধর্ম থেকে আলাদা। জল হলো একটা যৌগিক পদার্থ বা যৌগ যা একাধিক মৌলিক পদার্থের (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়েছে। নুন, চিনি, জল, চুন এসব হলো যৌগিক পদার্থ যাতে কোন কোন মৌল আছে তা নীচের সারণিতে বলা হলো।

যৌগের নাম	যৌগে কোন কোন মৌলের পরমাণু আছে
জল	হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
কার্বন ডাইঅক্সাইড	কার্বন, অক্সিজেন
চিনি	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন
নুন	সোডিয়াম, ক্লোরিন
পাথুরে চুন বা পোড়া চুন	ক্যালশিয়াম, অক্সিজেন

পরমাণুদের জোটবদ্ধ অবস্থাকে অণু (molecule, মলিকিউল) বলা হয়। হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুরা এককভাবে থাকে। কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু জুড়ে অণু তৈরি করে থাকে। যেমন ধরো অক্সিজেন, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, আয়োডিন এসবের অণুতে দুটো করে পরমাণু থাকে। নীচে তোমাদের হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন ও আয়োডিনের অণুর গঠন দেখানো হলো। এখানে অণুগুলোকে গোলাকার আকারে দেখানো হয়েছে। মনে রেখো, কোনো পরমাণু বা অণুর রং হয় না। ওটা বোঝাবার জন্য আঁকা হয়েছে।

যে-কোনো পদার্থের খালি চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু লক্ষ-কোটি অণু-পরমাণু থাকে। এখানে ওই গোলকের মধ্যে মৌলগুলোর সংক্ষিপ্ত নাম (যেমন H মানে হাইড্রোজেন, O মানে অক্সিজেন, Cl মানে ক্লোরিন) লেখা হয়েছে। মৌলের এই

সংক্ষিপ্ত নামকেই মৌলের চিহ্ন বলা হয়। যৌগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোটো যে কণা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে তাকে যৌগের অণু বলে। নীচে তোমাদের জল আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুর গঠন দেখানো হলো।

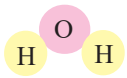

জল

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

কার্বন ডাইঅক্সাইড

ছবিগুলো দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো।

কোন যৌগের অণু	কী কী মৌল দিয়ে গঠিত	একটা অণুতে কোন মৌলের কটা পরমাণু আছে
জল		
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড		
কার্বন ডাইঅক্সাইড		

মনে রেখো, যে কোনো মৌল বা যৌগের চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু বহু লক্ষ কোটি পরমাণু/অণু থাকে। অণু বা পরমাণুর নিজস্ব কোনো রং নেই। আর একটা কথা খুব দরকারি—**ধাতুর যেসব ধর্মের কথা তোমরা পড়লে** (তাপ পরিবাহিতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, প্রসারণশীলতা, নমনীয়তা, রং) **সেসবের কোনোটাই কিন্তু ধাতুর পরমাণুর ধর্ম নয়**। তাহলে এসব ধর্ম কার ধর্ম? — যেকোনো ধাতুর মধ্যে বহু বহু লক্ষ কোটি পরমাণু থাকে। ওই অত সংখ্যক পরমাণু এক সঙ্গে জোট বেঁধে থেকে যে নমুনা তৈরি করে সেটাকে নিয়েই তুমি ধাতুর নানান ধর্মের পরীক্ষা করতে পারো। **তাহলে ওইসব ধর্ম হল সেই সমষ্টি বা জোটের ধর্ম। একক পরমাণুর রং, তাপ পরিবাহিতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, প্রসারণশীলতার কোনো অর্থ নেই।** তোমরা জানো যে সোনাকে পিটিয়ে খুব পাতলা পাত করা যায়, তাই আমরা যদি বলি 'সোনা খুব প্রসারণশীল ধাতু' তাহলে কথাটা ঠিক হবে। তা বলে যদি কেউ বলে 'সোনার পরমাণু প্রসারণশীল' তাহলে কিন্তু মোটেই ঠিক কথা বলা হবে না। আবার 'সোনার চেয়ে লোহা অনেক শক্ত ধাতু', কথাটায় ভুল নেই। কিন্তু তা বলে 'সোনার পরমাণুর চেয়ে লোহার পরমাণু শক্ত' এমন ভাবলে তা একেবারেই ভুল হবে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক মৌলের সংখ্যা 94 হলেও মানুষের তৈরি এবং প্রকৃতিতে পাওয়া যায় সব মিলিয়ে চিহ্নিত যৌগের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। কী করে এটা সম্ভব হয়? সম্ভব হয় প্রধানত দুটো কারণে : প্রথম কারণ হলো প্রকৃতিতে পরমাণুর সংখ্যা বহু বহু লক্ষ কোটি; দ্বিতীয় কারণ হলো পরমাণুরা নানানভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়তে পারে, ফলে নতুন নতুন যৌগ গঠিত হয়।

চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নামের ইংরেজি নামের বানানগুলো দেখো— Hydrogen ও Oxygen। বানান করে পুরো নামটা লিখতে হলে অনেক জায়গা লেগে যেত, আর ওইসব মৌল দিয়ে তৈরি যৌগগুলোর অণুকে প্রকাশ করতে সমস্যা হত! তাই বিজ্ঞানীরা মৌলগুলোর নামকে ছোটো করে লিখতে নানান পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই সংক্ষিপ্ত নামকেই মৌলের চিহ্ন বলা হয়।

১. মৌলের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষর দিয়ে চিহ্ন লেখা :

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	চিহ্ন
কার্বন	Carbon	C
নাইট্রোজেন	Nitrogen	N
সালফার	Sulfur	S
ফসফরাস	Phosphorus	P

২. নামের ইংরাজি বানানের প্রথম অক্ষর বড়ো হাতের (capital letter) ও ছোটো হাতের অন্য একটি অক্ষর (small letter) নিয়ে চিহ্ন লেখা । সারণিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে তিনটি মৌলের চিহ্ন লেখো।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	মৌলের চিহ্ন
কোবাল্ট	Cobalt	Co
ক্রোমিয়াম	Chromium	
ক্লোরিন	Chlorine	Cl
হিলিয়াম	Helium	
ম্যাগনেশিয়াম	Magnesium	Mg
ব্রোমিন	Bromine	

৩. মৌলের ল্যাটিন নামের বানানের প্রথম ও অন্য একটি নির্বাচিত অক্ষর ব্যবহারে চিহ্ন লেখা। সারণিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে তিনটি মৌলের চিহ্ন লেখো।

মৌলের নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম	মৌলের ল্যাটিন নামের বানান	চিহ্ন
পটাশিয়াম	ক্যালিয়াম	Kalium	K
সোডিয়াম	ন্যাট্রিয়াম	Natrium	
তামা	কিউপ্রাম	Cuprum	Cu
লোহা	ফেরাম	Ferrum	
সোনা	অরাম	Aurum	Au
রুপা	আর্জেন্টাম	Argentum	

সংকেত

নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া অন্যান্য মৌলের পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় এককভাবে থাকতে পারে না। মৌলের অণু বা যৌগের অণু একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক পদার্থের অণু ওই মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। অক্সিজেনের একটা অণুতে দুটো পরমাণু আছে, তাই অক্সিজেনের অণুর সংকেত O_2, যেখানে অণুতে পরমাণুর সংখ্যা চিহ্নের ডানদিকে একটু নীচে লেখা হয়েছে। **নীচের সারণিতে তিনটি মৌলের অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা লেখো।** কোনো মৌলের অণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে তাকে ওই মৌলের পারমাণবিকতা বলে।

মৌলের নাম	মৌলের একটি অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা	মৌলের অণুর সংকেত
অক্সিজেন	2	O_2
নাইট্রোজেন	2	
ক্লোরিন	2	
ব্রোমিন	2	Br_2
আয়োডিন	2	

এবার আমরা কিছু অধাতুর যৌগের সংকেত কীভাবে লেখা হয় তা দেখব। কোনো যৌগের সংকেত লিখতে হলে যৌগটি যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি তাদের চিহ্ন পাশাপাশি লিখতে হয়। তবে মৌলের চিহ্নগুলো পাশাপাশি লেখাটার কিছু নিয়ম আছে তা আমরা পরে জানব। তারপর যে মৌলের যতগুলো পরমাণু আছে সেই সংখ্যাটা তার চিহ্নের নীচে ডানদিকে লিখতে হয়। ধরো তোমাকে বলা হলো জলের একটা অণুতে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে। তাহলে তুমি জলের সংকেত লিখবে H_2O_1। অণুতে যদি কোনো মৌলের একটাই পরমাণু থাকে তবে সেই 1 আর লেখা হয় না, শুধু চিহ্ন লেখা হয়। তাহলে জলের সংকেত হলো H_2O। **শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো :**

যৌগের নাম	অণুতে কোন মৌলের কটি পরমাণু আছে	সংকেত লেখার নিয়ম	সংকেত
কার্বন ডাইঅক্সাইড	C একটি; O দুটি	আগে C; পরে O	CO_2
কার্বন মনোক্সাইড	C একটি; O একটি	আগে C; পরে O	
মিথেন	C একটি; H চারটি	আগে C পরে H	
অ্যামোনিয়া	N একটি; H তিনটি	আগে N, পরে H	NH_3
হাইড্রোজেন সালফাইড	H দুটি; S একটি	আগে H, পরে S	
সালফার ডাইঅক্সাইড	S একটি; O দুটি	আগে S, পরে O	SO_2
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	H একটি; Cl একটি	আগে H, পরে Cl	

কোনো যৌগে কোনো মৌলের একাধিক পরমাণু থাকলে সেই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বোঝাতে গ্রিক ভাষার বিভিন্ন সংখ্যাবাচক উপসর্গ যথা— ডাই, ট্রাই, টেট্রা বা পেন্টা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সারণির উদাহরণ দেখে অবশিষ্ট অংশগুলি পূরণ করো।

যৌগের নাম	সংকেত	ব্যাখ্যা
সালফার ডাইঅক্সাইড	SO_2	2 টি O পরমাণু বলে ডাইঅক্সাইড
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড	PCl_3	3টি Cl পরমাণু বলে ট্রাইক্লোরাইড
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	CCl_4	4টি Cl পরমাণু বলে টেট্রাক্লোরাইড
ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড	PCl_5	5টি Cl পরমাণু বলে পেন্টাক্লোরাইড
ফসফরাস ট্রাইফ্লুওরাইড	PF_3	
সালফার ট্রাইঅক্সাইড	SO_3	

যোজ্যতা

এসো আমরা নীচের সারণি পূরণ করি :

যৌগের নাম	সংকেত	কী কী মৌল আছে	মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে কটি H পরমাণু আছে
জল	H_2O	O ও H	2
মিথেন	CH_4	C ও H	
অ্যামোনিয়া	NH_3	N ও H	
ফসফিন	PH_3	P ও H	
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	HCl	H ও Cl	
হাইড্রোজেন আয়োডাইড	HI	H ও I	

আমরা লক্ষ করলাম অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়োডিন ও ক্লোরিন-এর একটি পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করেছে। দুটি মৌলের পরস্পর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজন ক্ষমতা বা যোজ্যতা বলে। কোনো মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে সেই সংখ্যা দিয়ে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়।

এতক্ষণ যা শিখলে তা থেকে নীচের সারণি পূরণ করো :

মৌল	কোন যৌগে আছে	মৌলের যোজ্যতা
অক্সিজেন	H_2O	2
নাইট্রোজেন	NH_3	
কার্বন	CH_4	
সালফার	H_2S	2
ক্লোরিন	HCl	

এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1 ধরে অন্য মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে। একে হাইড্রোজেনভিত্তিক যোজ্যতা বলে।

মনে রাখা জরুরি :

- কোনো মৌল বা যৌগের চোখে দেখার মতো ক্ষুদ্রতম নমুনাতেও বহু লক্ষ কোটি পরমাণু বা অণু থাকে।
- পরমাণু এবং অণু উভয়েই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- চোখে দেখতে পাওয়ার মতো যে-কোনো বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি অণু-পরমাণু অংশগ্রহণ করে।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির 'মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

১.১ কোনটি মৌল নয়— ক) তামা খ) কার্বন গ) সোনা ঘ) অ্যামোনিয়া

১.২ কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সংকেত হলো— ক) CCl খ) CCl_2 গ) C_4Cl ঘ) CCl_4

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

•y“þö”î “þyþ™ ç “þ!vþê þ™!îîy!£“þy ¢y•yî’“þ x•y“þî ö‰öë _____ £ëÐ

৩. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

3.1 “þyöþ™î ¢þ™!îîy£# ~„þ!Ýþ x•y“þî vþ”y£î’ ”yçÐ “þ!vþö“þî ¢þ™!îîy£# ~„þ!Ýþ x•y“þî vþ”y£î’ ”yçÐ

৩.২ অক্সিজেন অণুতে পরমাণুর সংখ্যা কত? অক্সিজেন অণুর সংকেত লেখো।

৩.৩ অ্যামোনিয়ার সংকেত লেখো। এই যৌগে নাইট্রোজেনের যোজ্যতা কত?

৩.৪ নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডের একটি অণুতে একটিই নাইট্রোজেন পরমাণু আছে। তাহলে নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডের সংকেত কী হবে লেখো।

৪. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

ধাতু ও অধাতুর তিনটি সাধারণ পার্থক্য লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ কুইনাইন থেকে পাওয়া যায় — (ক) ম্যালেরিয়ার ওষুধ (খ) সর্দিকাশির ওষুধ (গ) ডেঙ্গির ওষুধ (ঘ) ক্যানসারের ওষুধ।

১.২ যে পরিবর্তনটি ভৌত পরিবর্তন তা হলো— (ক) কাগজ পুড়ে যাওয়া (খ) পোড়া চুন থেকে কলিচুন তৈরি (গ) জল ফুটে বাষ্প হওয়া (ঘ) লোহায় মরচে ধরা।

1.3 “by>yÎ !%b£« £öœy¤ôôö¡ S„bV Na S...V Fe S†V Au S‡V Cu।

১.৪ অ্যামোনিয়ার সংকেত হলো— (ক) NH (খ) N_3H (গ) NH_3 (ঘ) NH_2।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ওষুধ পাওয়া যায় এমন একটি উদ্ভিদ হলো _____।

২.২ পিতলের বাসনে সবুজ ছোপ ধরা একটি _____পরিবর্তন।

২.৩ öëïö†Î Çbo“b> „b’yö„b _____ ÎöœÐ

৩. ঠিক বাক্যের পাশে ‘✓’ আর ভুল বাক্যের পাশে ‘×’ চিহ্ন দাও :

৩.১ উদ্ভিদ পরিবেশে অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩.২ ভূমিকম্প ও হড়পা বান পর্যাবৃত্ত ঘটনা।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ মানুষ জামাকাপড়ের জন্য কীভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে?

৪.২ একটি উভমুখী পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ খাবারের জন্য পালন করা হয় এমন দুটো প্রাণীর নাম লেখো।

৫.২ জলের অণুর সংকেত লেখো। এই যৌগে অক্সিজেনের পরমাণুর যোজ্যতা কত?

৫.৩ জলের মধ্যে তড়িৎ পাঠিয়ে যে দুটি মৌল পাওয়া যায় তাদের নাম লেখো।

৫.৪ মিথেন ও ফসফিনের অণুর সংকেত যথাক্রমে CH_4 ও PH_3। এই দুটি যৌগে C ও P পরমাণুর যোজ্যতা কত?

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ উদ্ভিদ প্রাণীদের ওপর কীভাবে নির্ভর করে?

৬.২ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের দুটি পার্থক্য লেখো।

৬.৩ ভৌত পরিবর্তনের তিনটি উদাহরণ দাও।

৬.৪ কয়লার বড়ো টুকরোর চেয়ে কয়লার গুঁড়োর দহন দ্রুত ঘটে কেন তা ব্যাখ্যা করো।

4 মাপজোক বা পরিমাপ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিমাপে এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- উদাহরণসহ প্রাথমিক ও লব্ধ রাশির পার্থক্য করতে পারবে।
- উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর ও সময়ের পরিমাপ করতে পারবে।

যা পরিমাপ করা যায় তাকেই ভৌত বা প্রাকৃতিক রাশি বলা হয়। পরিমাপযোগ্য রাশিগুলি হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ঘনত্ব, ভর, সময় ইত্যাদি। যে সমস্ত রাশি অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে না, তাদের মৌলিক বা প্রাথমিক রাশি বলা হয়। যেমন দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ইত্যাদি। আবার এমন কিছু রাশি আছে যারা একাধিক মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল। তাদের বলা হয় লব্ধ রাশি যেমন ঘনত্ব, আয়তন, বেগ ইত্যাদি। রাশিগুলিকে পরিমাপের সময় সংখ্যা ছাড়াও আরও কিছু লেখা হয়, যাকে বলা হয় একক। যেমন সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি। প্রাথমিক রাশির একক হলো প্রাথমিক একক এবং লব্ধ রাশির, একক হলো লব্ধ একক। তাই সেকেন্ড হলো প্রাথমিক একক। বেগের একক মিটার/সেকেন্ড লব্ধ একক। কোনো রাশিকে পরিমাপ করতে হলে ঐ রাশির সুবিধাজনক অংশ দিয়ে পরিমাপ করতে হয়, তাকেই আমরা ঐ রাশির একক বলি। তাই দূরত্ব মাপতে আমরা মিটার ব্যবহার করি, যা দূরত্বের একক। ধরা যাক, কোনো মানুষের উচ্চতা তার নিজের হাতের দৈর্ঘ্যের $3\frac{1}{2}$ গুণ। এর থেকে আমরা ঐ মানুষটির উচ্চতার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারি না যে মানুষটি বেঁটে না দীর্ঘদেহী। এইসব অসুবিধা দূর করতে এমন একক নিতে হবে যাকে সবাই প্রমাণ হিসাবে মেনে নেবে এবং ব্যক্তি বা স্থানভেদে যা অভিন্ন হবে। পরিমাপের অনেক পদ্ধতি আছে যেমন CGS, FPS, MKS ইত্যাদি। পরিমাপের জটিলতা এড়াতে 1960 সালের পর তৈরি করা হয় SI পদ্ধতি, যা Systeme International নামে পরিচিত।

SI পদ্ধতিতে সাতটি প্রাথমিক একক

রাশি	একক
দৈর্ঘ্য	মিটার (m)
ভর	কিলোগ্রাম (kg)
সময়	সেকেন্ড (s)
উষ্ণতা	কেলভিন (K)
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (A)
আলোর তীব্রতা	ক্যান্ডেলা (cd)
পদার্থের পরিমাণ	মোল (mol)

কোনো রাশি তার এককের কতগুণ তা হিসাব করে ওই রাশিটাকে মাপা হয়।

দৈর্ঘ্য ও ভরের একক :

প্রমাণ মিটার হলো ফ্রান্সের ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস প্রতিষ্ঠানে 273K তাপমাত্রায় রাখা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম (90:10) সংকর ধাতুনির্মিত একটি দণ্ডের দুটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব। যদিও আধুনিক সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। সেটা তোমরা পরে জানবে। আবার প্রমাণ কিলোগ্রাম হলো ঐ একই প্রতিষ্ঠানের রক্ষিত একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম বেলনের ভর।

প্রমাণ মিটার থেকে তার গুণিতক ও উপগুণিতক এককগুলি নির্ণয় করা যায়। 10-এর বিভিন্ন ঘাতে গুণ করে আমরা গুণিতক একক (multiple unit) এবং 10-এর বিভিন্ন ঘাতের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে উপগুণিতক একক (sub-multiple unit) নির্ণয় করি। নীচের টেবিল 1-এ SI পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপার বড়ো থেকে ক্রমশ ছোটো উপগুণিতক এককগুলো (submultiple unit) লক্ষ করো। ওপর থেকে পরপর প্রথমটার 10 গুণ হলো দ্বিতীয়টা। আবার, নীচ থেকে ওপরে পরপর প্রথমটার 1/10 গুণ হলো দ্বিতীয়টা।

10 mm = 1 cm	100 cm = 1 m
10 cm = 1 dm	1000 m = 1 km
10 dm = 1 m	

টেবিল 1 টেবিল 2

ভালোভাবে লক্ষ করো :

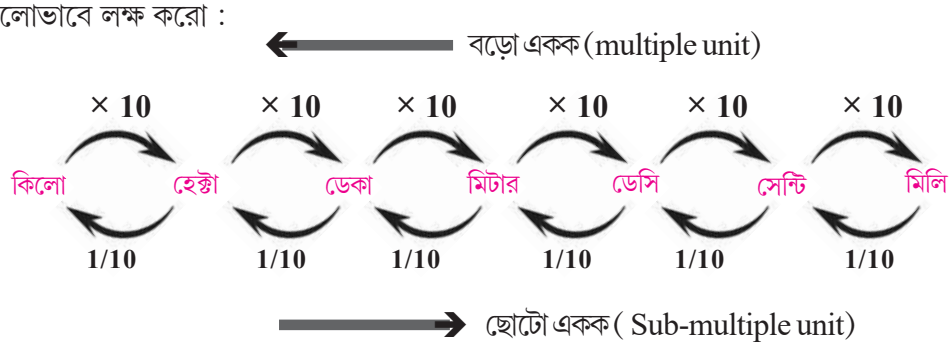

একক	চিহ্ন
কিলোমিটার	km
হেক্টামিটার	hm
ডেকামিটার	dam
মিটার	m
ডেসিমিটার	dm
সেন্টিমিটার	cm
মিলিমিটার	mm

1 km = 1 × 10 hm = 10 hm

= 100 dam

= .....? cm

আবার,

$1\ m = \frac{1}{10}\ da\ m = 0.1\ dam$

$= \frac{1}{1000}\ km = 0.001\ km$

= ..... ? hm

আবার, 1 মিটার = 1000 মিলিমিটার = 10^3 মিলিমিটার এবং 1 মিলিমিটার = .000001 কিলোমিটার = 10^{-6} কিলোমিটার।

এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন খুব ক্ষুদ্র মানের রাশি অন্যদিকে অনেক বড়ো মানের রাশিকেও মাপা যায়। যেমন, একটা সরু তারের ব্যাস মাপা যায় মিলিমিটারে, আবার কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব মাপা যায় কিলোমিটার -এ।

একইভাবে ভর পরিমাপের সময় মিটারের জায়গায় গ্রাম লিখে ঐ একই টেবিলের সাহায্যে বড়ো একক (multiple unit) ও ছোটো এককে (sub-multiple unit) যাওয়া যায়।

হাতেকলমে

তোমাদের বিদ্যালয়ে জ্যামিতি বাক্স থেকে স্কেলটা বের করে দেখো। স্কেলের একদিকে 15 সেন্টিমিটার আছে অন্যদিকে 6 ইঞ্চি (FPS পদ্ধতিতে উপএকক) আছে। তোমাদের খাতার উপর দুটি বিন্দু আঁকো। ঐ স্কেলের সাহায্যে ঐ দুটি বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় কর। এখান থেকে 1 ইঞ্চি সমান কত সেমি তা নির্ণয় করো।

ক্ষেত্রফলের পরিমাপ :

এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নেওয়া হয় ও তারপর নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ।

একটি ফুটবলকে হাত দিয়ে ধরো। তোমার হাত ফুটবলটার ওপরের যে জায়গাটাকে স্পর্শ করতে পারবে, বা ফুটবলটার ওপর হাত বুলিয়ে তুমি যে তলটাকে অনুভব করতে পারো সেই সমগ্র তলটা ফুটবলটির উপরিতল।

এখন তুলি (brush) দিয়ে ঐ পুরো তলটাকে রং করা হলো।

তুমি বলের যে জায়গাটি রং করলে তার পরিমাপ হলো ওই বলটির **ওপরের তলের ক্ষেত্রফল**। এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য ফুটবলের ব্যাস পরিমাপ করা হয় ও নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রফল = π × ব্যাস × ব্যাস। [π (উচ্চারণ 'পাই') একটি সংখ্যা, এর মান প্রায় 3.14]

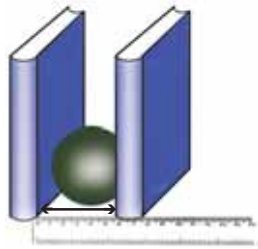

বলটাকে একটা সমতলের ওপর রেখে তার দুপাশে স্পর্শ করে দুটো বই রাখো এবার বইদুটোর দূরত্ব স্কেলের সাহায্যে মাপো। এই মাপই হলো বলটির ব্যাস। (পাশের ছবিতে দেখো)

হাতেকলমে

তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের উপরের তলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সেন্টিমিটার স্কেল দিয়ে নির্ণয় করো। যদি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে মিটারে মাপা হয় তবে তলটির ক্ষেত্রফল কত? এর থেকে বর্গসেমি ও বর্গমিটারের সম্পর্ক পেয়ে যাবে।

নীচের হিসাবগুলি দেখো। ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বামদিকের মান ডানদিকের 100 গুণ।

অর্থাৎ, 1 বর্গমিটার = 100 বর্গ ডেসিমিটার

= 100 × 100 বর্গ সেমি = 10000 বর্গ সেমি

আয়তনের পরিমাপ :

বস্তু মাত্রই কিছু স্থান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যতটা স্থান দখল করে থাকে তাকে ওই বস্তুর আয়তন বলে। একটা তরলের আয়তন কীভাবে মাপবে? একটা শুকনো আয়তন মাপনি চোঙ নাও। চোঙটাকে টেবিলের উপর খাড়াভাবে রাখো। এখন যে তরলের আয়তন মাপতে হবে, সেটির পুরোটাই খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে চোঙটার মধ্যে ঢালো। তরলটা স্থির অবস্থায় এলে, তরলের ওপরতল চোঙের দেয়ালের স্কেলের যে দাগ স্পর্শ করবে তার পাঠ নাও। ওই পাঠই হলো ওই তরলের আয়তন। SI পদ্ধতিতে আয়তনের একক 'ঘন মিটার'। আয়তনের আরও প্রচলিত একক আছে যেমন ঘন সেন্টিমিটার (cc), লিটার (L), মিলিলিটার (mL) ইত্যাদি।

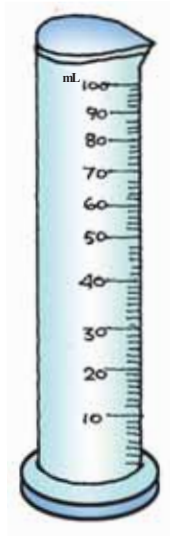

মাপনি চোঙ

1 ঘনমিটার = 1000 ঘন ডেসিমিটার = 1000 × 1000 ঘন সেন্টিমিটার = 10^6 সেন্টিমিটার

আবার 1000 ঘন সেন্টিমিটার = 1 ঘন ডেসিমিটার = 1 লিটার = 1000 মিলিলিটার

জলে অদ্রাব্য এবং জল অপেক্ষা ভারী বস্তুর আয়তন সহজেই মাপনি চোঙের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কীভাবে মাপনি চোঙের সাহায্যে জল অপেক্ষা ভারী বস্তুর আয়তন মাপা যায়? — প্রথমে সিলিন্ডারে কিছুটা জল নাও। জলের আয়তন সিলিন্ডারের পাঠ থেকেই পাওয়া যাবে। এবার ওই জলে অদ্রাব্য এবং জল অপেক্ষা ভারী বস্তুটিকে সাবধানে সিলিন্ডারের জলে সম্পূর্ণভাবে ডোবাও। এর ফলে বস্তুটি তার আয়তনের সমপরিমাণ জলকে অপসারিত করবে এবং চোঙের মধ্যে জলতল উপরে উঠে যাবে। জল স্থির হলে জলের উপরতল সিলিন্ডারের যে দাগটির সঙ্গে মেলে সেটি হলো জল এবং বস্তুটির মোট আয়তন। এই পাঠ থেকে জলের আয়তন অর্থাৎ প্রথম পাঠ বাদ দিলে বস্তুটির আয়তন পাওয়া যাবে।

সময় পরিমাপ :

কোনো দুটি ঘটনার মধ্যে যতক্ষণ ব্যবধান তাকেই আমরা সময় বলি। সময় পরিমাপের একক সেকেন্ড। কোনো জায়গায় আজকে যেভাবে সূর্যের আলো পড়ে ঠিক পরের দিন একইভাবে সূর্যের আলো পড়লে ঐ সময়ের ব্যবধানকে বলা হয় 1 সৌরদিন।

1 সৌরদিন = 24 ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা = 60 মিনিট 1 মিনিট = 60 সেকেন্ড 1 বছর = 365 দিন

সারা বছরের সৌরদিন যোগ করে, যোগফলকে 365 দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই **'গড় সৌরদিন'**। আর এই গড় সৌরদিনকে আমরা 24 দিয়ে ভাগ করে পাই 1 ‡^Ý'byÐ

নীচের সারণির প্রাথমিক ও লব্ধ রাশিগুলি চিহ্নিত করো।

রাশি	প্রাথমিক না লব্ধ রাশি
দৈর্ঘ্য	
ভর	
ক্ষেত্রফল	
আয়তন	

মনে রাখা জরুরি :

- একক ছাড়া পরিমাপের কোনো অর্থ হয় না। প্রাথমিক রাশির একক হলো প্রাথমিক একক এবং লব্ধ রাশির একক হলো লব্ধ একক।
- SI পদ্ধতির সুবিধা হলো এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন খুব ক্ষুদ্র মানের রাশি অন্যদিকে অনেক বড়ো মানের রাশিকেও মাপা যায়।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির 'মাপজোক বা পরিমাপ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

১.১ বস্তুর উপরিতলের পরিমাপ যে রাশি দিয়ে প্রকাশিত হয় তা হলো — ক) আয়তন খ) উচ্চতা গ) ভর ঘ) ক্ষেত্রফল

১.২ বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপার একক হলো— ক) গ্রাম খ) কেলভিন গ) সেকেন্ড ঘ) মিটার

২. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য 2 মিটার ও প্রস্থ 1 মিটার। টেবিলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

২.২ স্কেল, দাঁড়িপাল্লা, স্টপ ওয়াচ ও মাপনি চোঙ — এদের কোনটির সাহায্যে কোন ভৌতরাশি মাপা হয়?

৩. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশি বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ দাও।

৩.২ কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল কেন লব্ধরাশি তার স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৩.৩ কোনো পেন্সিলের দৈর্ঘ্য আর তোমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব — কোনটা সেন্টিমিটার ও কোনটা মিটারে মাপা সুবিধাজনক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে কারণ দেখাও।

5 বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত স্থিতি ও গতি সংক্রান্ত উদাহরণ চিহ্নিত করতে পারবে।
- বল কী তার গুণগত ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত উদাহরণের সাহায্যে স্পর্শ-করে-ক্রিয়াশীল বল ও দূর-থেকে-ক্রিয়াশীল বলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার শক্তিকে চিহ্নিত করতে এবং সহজ পরীক্ষা ও উদাহরণের সাহায্যে শক্তির রূপান্তর প্রদর্শন করতে পারবে।
- সূর্য থেকে শুরু করে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ আলোচনা করতে পারবে।
- খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, খাদ্য পিরামিড এবং লিন্ডেম্যানের দশ শতাংশ সূত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

স্থিতি ও গতির ধারণা

যদি কোনো বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে তবে তাকে গতিশীল বস্তু আর স্থান পরিবর্তন না করলে তাকে স্থির বস্তু বলা হয়। এবার তোমরা চারপাশে যে সব বস্তু গতিশীল বা স্থির তাদের নাম খাতায় লেখো। চলন্ত বাস বা ট্রেন থেকে বাইরের দিকে তাকালে গাছপালা, বাড়িঘর গতিশীল বলে মনে হবে। কিন্তু ট্রেন বা বাসের বাইরে রাস্তায় বা মাঠে দাঁড়িয়ে ওই বস্তু গুলোকে দেখলে তাদের স্থির থাকতে দেখবে। তাহলে তুমি কোনো বস্তুকে স্থির বা গতিশীল যা দেখো তা তোমার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বলের ধারণা ও একক

কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনতে বা গতির বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাতে অথবা গতির দিক পরিবর্তন করতে বস্তুর উপর যা প্রয়োগ করা হয় তাকেই আমরা বল (force, ফোর্স) বলি। ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার সময় বল প্রয়োগের এমন উদাহরণ খুঁজে পাও কি না আলোচনা করো। কোনো কোনো কাজ করতে টানা, ঠেলা বা উভয়েরই প্রয়োজন হয়। যেমন টেবিল থেকে ড্রয়ার বের করতে টানার প্রয়োজন। টানা বা ঠেলার সাহায্যে টেবিল সরাতে হয়।

তাহলে কোনো কাজ করতে কখনো কখনো কোনো জিনিস টানতে বা ঠেলতে হয়। **এই টানা বা ঠেলা হল আসলে একটি বল।**

নীচের ছকে আমাদের প্রতিদিনের কিছু কাজের কথা লেখা আছে। কোন কাজে টানা, কোন কাজে ঠেলা আর কোন কাজে টানা বা ঠেলা দুটি দরকার তা ভাবো। তারপর প্রতিটি কাজের পাশে ফাঁকা জায়গায় টিক '✓' চিহ্ন দাও।

কাজ	টানা	ঠেলা
গাছ থেকে ফুল তুলতে		
ড্রয়ার বন্ধ করলে		
ফুটবলে কিক করলে		
জামার বোতামের ফুটো দিয়ে বোতাম ঢোকালে		
দরজা খুললে		
দরজা বন্ধ করলে		
সুইচবোর্ডে প্লাগ লাগাতে		

কোনো বস্তুর আকৃতি (shape) বা অবস্থান (position) পরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন হয় তাও বল। যেমন একটি স্প্রিং-এর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটাতে বলের প্রয়োজন। এই সংকোচন ও প্রসারণ যত বেশি হবে প্রয়োজনীয় বলের মানও তত বেশি হবে। একইভাবে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও বলের প্রয়োজন। যেমন ফুটবলকে দূরে পাঠানো বা কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

স্প্রিং-এর সংকোচন

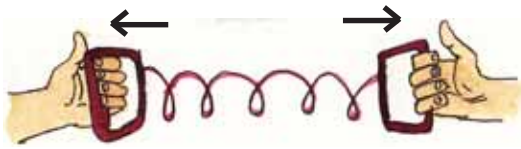

স্প্রিং-এর প্রসারণ

বলের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি বাইরে থেকে যা প্রয়োগের ফলে স্থির বস্তু সচল হয় বা সমবেগে গতিশীল বস্তু থেমে যায় বা বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে বা বস্তুর আকৃতি, আয়তন বা অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাকেই আমরা বল বলি। SI পদ্ধতিতে বলের একক হলো নিউটন। CGS পদ্ধতিতে বলের একক হলো ডাইন। 1 নিউটন = 100000 ডাইন।

আগের আলোচনায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর ওপর বল প্রয়োগের জন্য বস্তুকে স্পর্শ করতে হয়।

কিন্তু যদি লোহার পেরেক বা টুকরোর কাছে কোনো চুম্বককে আনা হয় তবে স্পর্শ ছাড়াও পেরেক বা টুকরোকে চুম্বক আকর্ষণ করবে। তাছাড়াও একটি রবারের বলকে টেবিলের উপর গড়িয়ে দিলে টেবিলের প্রান্তে পৌঁছানোর পর সেই বলটি নীচেই পড়বে। যদিও প্রাথমিকভাবে আমরা নীচের দিকে কোনো বল (force) প্রয়োগ করিনি। প্রথম ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলটি **চৌম্বক বল এবং** দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলটি **অভিকর্ষ বল। এই বলগুলি হল স্পর্শহীন বল বা স্পর্শছাড়া ক্রিয়াশীল বল।**

পৃথিবী কোনো বস্তুকে যে বলে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে তাকেই অভিকর্ষ বল বলা হয়। এই বলেরই আরেক নাম হলো 'ওজন'। যেহেতু ওজন একটি **বল (Force)** তাই **SI** পদ্ধতিতে ওজনের একক 'নিউটন'।

ওজনকে পরিমাপ করা হয় স্প্রিং তুলা যন্ত্রের সাহায্যে যা তোমাদের পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে। সূচকযুক্ত একটা স্প্রিং-এর পাশে একটা ওজন নির্ণায়ক স্কেল থাকে। সূচকটি প্রাথমিকভাবে স্কেলের শূন্য দাগকে সূচিত করে। স্প্রিং-এর নীচের দিকের খোলা প্রান্তে যুক্ত থাকা আংটায় বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিং প্রসারিত হয়। তখন স্কেলের ওপর সূচকের অবস্থান থেকে বস্তুর ওজন জানা যায়।

শক্তির ধারণা ও প্রকারভেদ

কাজ করার সামর্থ্যকে আমরা শক্তি বলি। পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ থেকে শক্তি খরচ হয়। এই শক্তি আমরা খাদ্য থেকে পাই। শক্তি অনেক প্রকারের হতে পারে— (1) যান্ত্রিক শক্তি (2) তাপ শক্তি (3) শব্দ শক্তি (4) আলোক শক্তি (5) তড়িৎ শক্তি (6) চৌম্বক শক্তি (7) রাসায়নিক শক্তি ও (8) পারমাণবিক শক্তি। যান্ত্রিক শক্তি দুইপ্রকারের হয়— (a) গতিশক্তি (b) স্থিতিশক্তি। এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

গতিশক্তি :

কোনো বস্তুর গতির জন্য বস্তুটি কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকেই গতিশক্তি বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় দৈর্ঘ্য লম্ফনের জন্য খেলোয়াড়কে দৌড়ে আসতে হয়। এই দৌড়ই কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে। ঝড়ে কখনো কখনো গাছপালা, বাড়িঘর ভেঙে পড়ে, ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড়ের প্রচণ্ড গতির জন্য তার মধ্যে গতিশক্তি থাকে যা ভেঙে ফেলতে বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। একইভাবে নদীতে পালতোলা নৌকা চালাতে বায়ুর গতিশক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

ঝড়ের গতিশক্তি বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়

বায়ুর গতিশক্তিতেই পালতোলা নৌকা চলে

স্থিতিশক্তি :

যখন বস্তুর অবস্থান বা আকৃতির পরিবর্তন ঘটে তখন এই শক্তি বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত হয়। যেমন মাটিতে কাঠের দণ্ডকে ঢোকানোর জন্য লোহার ভারী হাতুড়িকে কাঠের দণ্ড থেকে উঁচুতে তুলে তার অবস্থান পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে হাতুড়ির লোহার অংশটিতে শক্তি সঞ্চিত হয়। একে স্থিতিশক্তি বলা হয়।

এছাড়াও গুলতির রাবারের ব্যান্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে ছোট পাথরের টুকরোকে ছুড়ে দেওয়া যায়। রাবারের ব্যান্ডের এই আকৃতি পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়। একইভাবে কোনো স্প্রিংকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে ছোটো কাগজের বলকে ছিটকে ফেলা যায়। বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান হয়। একইভাবে ধনুকের দড়িতে টান দিয়ে আকৃতি পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থিতিশক্তির জোগান দেওয়া হয়।

এক প্রকার শক্তি থেকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর

1. **যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি :**
   দুটো হাতের তালু পরস্পর ঘষলে হাত গরম হয়। এখানে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

হাত ঘষা হলো

2. **যান্ত্রিক শক্তি থেকে শব্দ শক্তি :**
   পিতলের বা কাঁসার বাটি বা থালা হাত থেকে পড়ে গেলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। শব্দকে বন্ধ করতে আমরা হাত দিয়ে চেপে ধরি। থালা বা বাটির কম্পনের জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়, যা যান্ত্রিক শক্তি। এখানে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ঘণ্টা বাজালেও যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

3. **যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি :**
   জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জলকে উঁচু থেকে টারবাইনের প্রপেলারের উপর ফেলা হয় এবং প্রপেলার ঘুরতে থাকে। এতে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে বায়ুর গতিকে কাজে লাগিয়ে হাওয়া কলের পাখা ঘোরানো হয়। এর সঙ্গে যুক্ত জেনারেটারের আর্মেচারকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

4. **তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি :**
   পাখার সুইচ অন করলে পাখা ঘুরতে থাকে। এটি তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ।

5. **রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি:**
   একটু পোড়া চুন একটি স্টিলের বাটিতে নিয়ে অল্প পরিমাণ জল দেওয়া হলো। এবার বাটিটি ছুঁলে বুঝবে যে সেটি গরম হচ্ছে। এখানে পোড়া চুনের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে । এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

পোড়া চুনে জল দেওয়া হলো

6. তড়িৎ শক্তি থেকে আলোক শক্তি :

বাল্ব জ্বালানোর সময় তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শুধু এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

সারণিতে কিছু হাতেকলমে পরীক্ষার কথা বলা হলো। শক্তি কোন ধরন থেকে কোন ধরনে রূপান্তরিত হচ্ছে তা লেখো।

পরীক্ষা	শক্তি কোন ধরন থেকে কোন ধরনে রূপান্তরিত হচ্ছে?
1. একটা ঢাক পেটানো হলো	
2. আতসবাজি পোড়ানো হলো	
3. ধনুকের সাহায্যে একটা তির ছোঁড়া হলো	
4. বাজি ফাটানো হলো	
5. একটা বালব জ্বালানো হলো	
6. একটা চেপে-রাখা স্প্রিং ছিটকে উঠল	
7. কয়লা পোড়ানো হলো	
8. সৌর কুকার চালু করা হলো	
9. একটা বল উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো	

শক্তির উৎস

প্রতিদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হল খাবার। এই উৎসগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়। (1) প্রাণীজ উৎস, (2) উদ্ভিজ্জ উৎস। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের উৎস সবুজ উদ্ভিদ। তোমরা আগেই জেনেছ উদ্ভিদ সূর্যের আলো নিয়ে অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে নিজেই খাদ্য তৈরি করে।

পৃথিবীতে সব খাবারের শক্তির উৎস সূর্য। সূর্যের শক্তি খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে জমা থাকে।

আমরা যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করি তা মূলত দুই প্রকার— (1) তাপবিদ্যুৎ শক্তি, (2) জলবিদ্যুৎ শক্তি। প্রধানত কয়লা পুড়িয়েই তাপবিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এছাড়াও আমাদের রাজ্যে গ্যাস পুড়িয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জলের স্থিতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইনের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এছাড়াও খরস্রোতা নদীর গতিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। সূর্যের তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং ঘনীভূত হওয়ার পর বরফরূপে পর্বতের উপর জমা হয় যা নদীর জলের উৎস।

কয়লা তৈরির কথা :

বহু কোটি বছর আগের গাছপালার অবশেষ মাটির নীচে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে গরমে আর চাপে কয়লায় পরিণত হয়। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পলির নীচে থাকতে থাকতে বহু কোটি বছর পরে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়। দীর্ঘ সময়ে ঐ পলিও পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়। পেট্রোলিয়াম থেকেই আমরা ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানি পাই। তাই সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তির উৎস সূর্য একথা বলা যায়।

কয়লার মধ্যে গাছের পাতার ফসিল

সূর্যই সব শক্তির উৎস

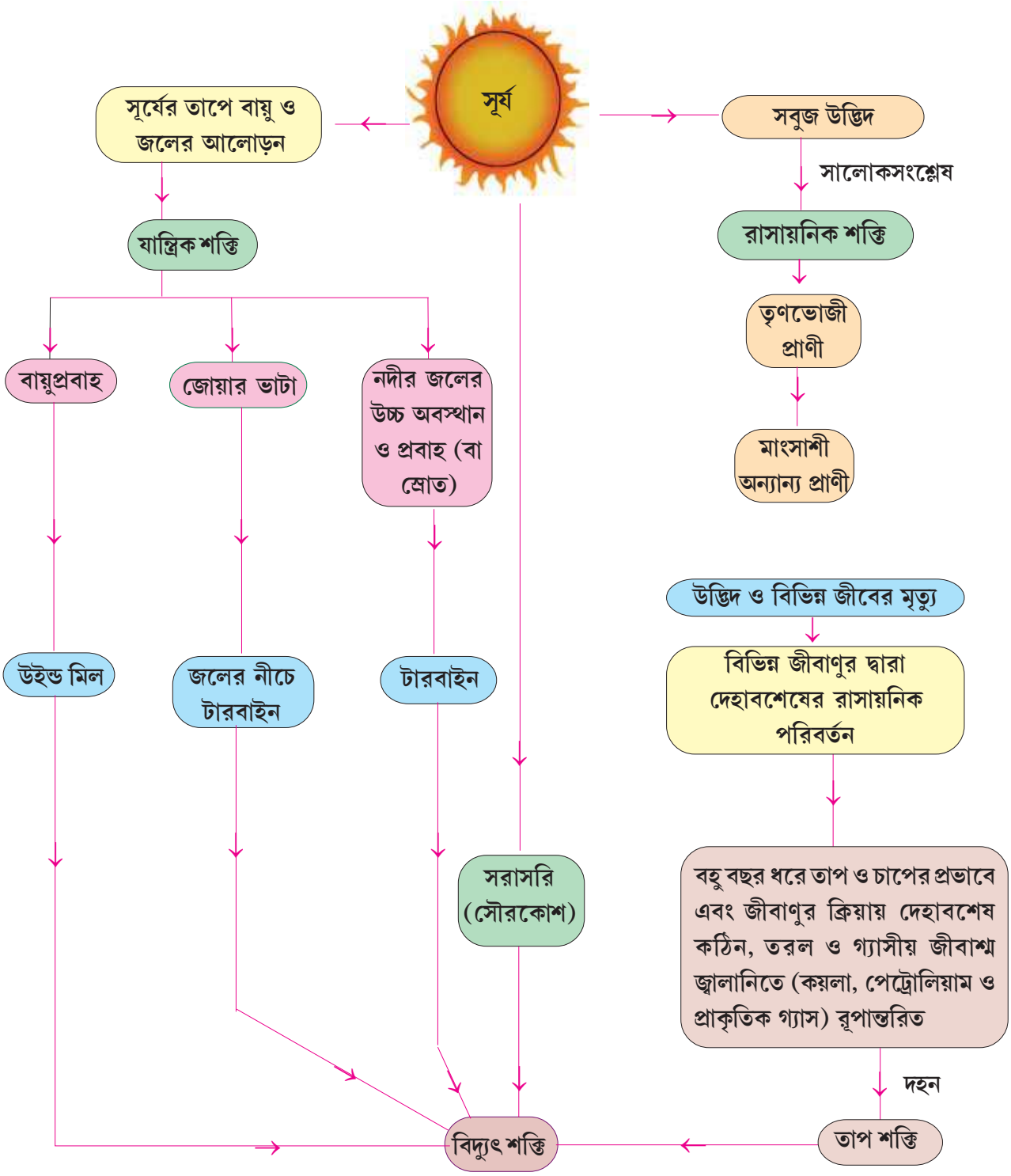

শক্তি শৃঙ্খলের ধারণা :

সৌরশক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ নিজের দেহে খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে তাই উদ্ভিদকে বলা হয় উৎপাদক। কিছু প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা হলো প্রথম শ্রেণির খাদক। বাকি প্রাণীদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণির খাদককে খায় তারা দ্বিতীয় শ্রেণির। কিছু প্রাণী আছে যারা উদ্ভিদ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদককে খায় তারা হলো সর্বভুক। যেমন মানুষ।

নীচের ছবিতে ফাঁকা বাক্সগুলো পূরণ করো।

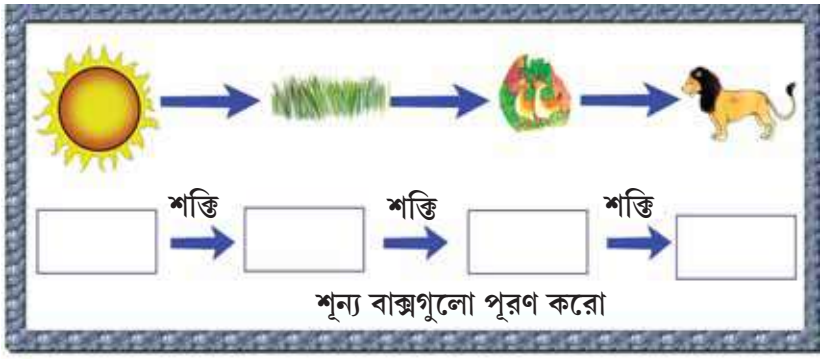

এসো, এবার একটা খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি করি।

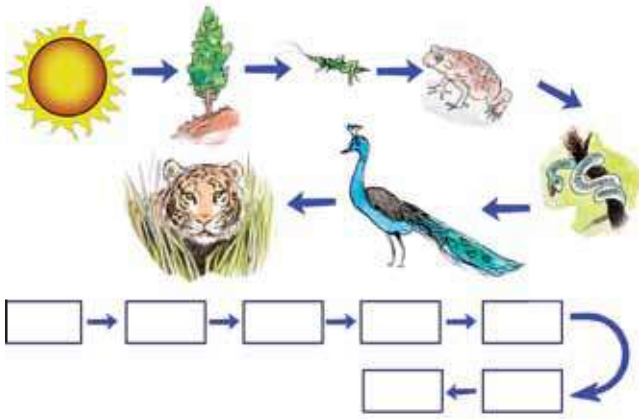

তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে খাদ্য শৃঙ্খলে একটা প্রাণী একবার অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। তখন সে খাদক। আবার পরে সেই প্রাণীটা নিজেই হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর খাদ্য হবে। এরকম পর্যায়ক্রমিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত শৃঙ্খলকেই বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain)। উপরের খাদ্য শৃঙ্খলে যুক্ত এক জীব থেকে অন্য জীবে পর্যায়ক্রমে শক্তি প্রবাহিত হয়।

নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো। ছবিতে কতগুলো খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাচ্ছ, গুনে লেখার চেষ্টা করো।

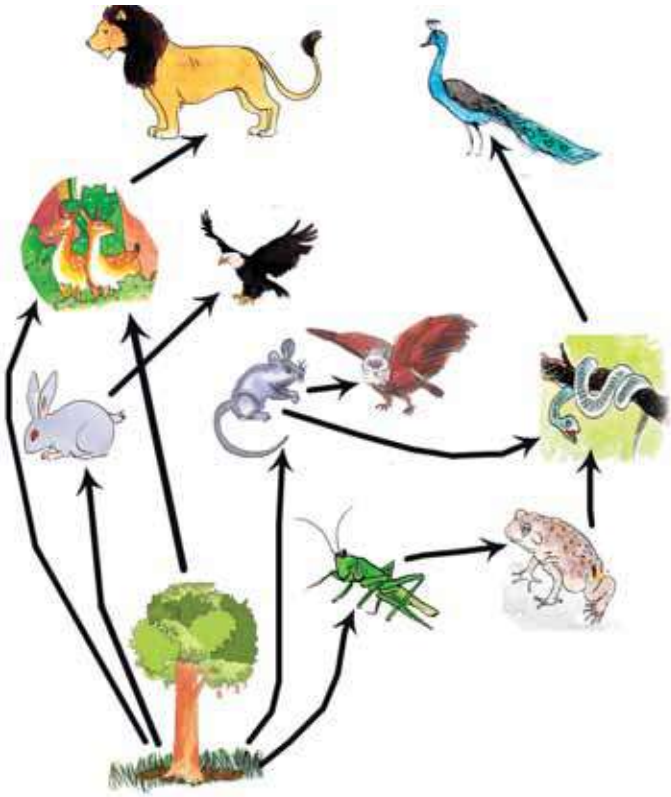

ছবিতে তাহলে কী দেখলে? একই উদ্ভিদ বা প্রাণী, খাদ্য-খাদক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ায় খাদ্যশৃঙ্খলগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা জালের মতো দেখতে ছবি তৈরি করেছে। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন খাদ্যশৃঙ্খলগুলো মিলে জালের মতো যে ছবি তৈরি করে সেটাই হলো খাদ্যজাল (Food web)।

এবারে নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো। খাদ্যশৃঙ্খলের জীবদের এক একটা আলাদা আলাদা ধাপে রাখা হয়েছে। একটি শৃঙ্খলের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের ধাপে ধাপে সাজানোর ফলে একটি ছবি তৈরি হয় যাকে খাদ্য পিরামিড (Food pyramid) বলে।

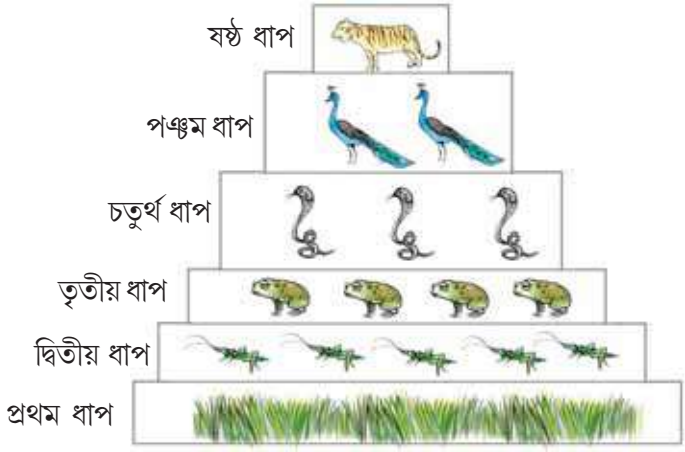

খাদ্য পিরামিড

1. প্রথম ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? .....।

2. দ্বিতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? প্রথম শ্রেণির খাদক।

3. তৃতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? .....।

4. চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী কী? .....।

5. প্রথম ধাপ আর দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল বা অমিল আছে?

সেগুলি লেখার চেষ্টা করো। .....।

6. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল আছে সেগুলো ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

খাদ্য পিরামিডের এক একটা ধাপই হলো এক একটা পুষ্টিস্তর বা ট্রফিক লেভেল (Trophic level)।

প্রাণীরা খাবার কেন খায়? শক্তি পাওয়ার জন্য। আচ্ছা বলো তো প্রথম ধাপে উদ্ভিদের দেহে যা শক্তি জমা ছিল ঘাসফড়িংরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে কি সেই শক্তি পুরোটাই পায়? আবার একটা ঘাসফড়িং-এর দেহে যতটা শক্তি জমা আছে, একটা ব্যাং ওই ঘাস ফড়িংকে খেয়ে কি সেই শক্তির পুরোটাই পাচ্ছে?

আসলে উদ্ভিদেরা নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করার সময় সূর্যের শক্তির যে অংশ শোষণ করে, তার বেশ কিছুটা অংশ নিজেদের দেহে জমা করে রাখতে পারে বা তাদের দেহ গঠনের কাজে লাগে। উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের দেহে জমা থাকা এই প্রায় দশ শতাংশ শক্তিই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের তৃণভোজী প্রাণীরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। আবার এই তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করলো তার প্রায় দশ শতাংশ সে তার নিজের দেহ গঠনে কাজে লাগায় বা দেহে জমা করে রাখতে পারে। তৃণভোজী প্রাণীদের দেহে জমা থাকা এই দশ শতাংশ (প্রায়) শক্তিই পরের ট্রফিক লেভেলে থাকা মাংসাশী প্রাণীরা খাবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এর ফলে কী বোঝা গেল? প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে মোট গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ দেহ গঠনের কাজে লাগে। আর কেবল এই শক্তিটুকুই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে থাকা প্রাণীরা সংগ্রহ করতে পারে। এক ট্রফিক লেভেলে থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরণের সময় শক্তির কতটা অপচয় ঘটে— সেটা একজন বিজ্ঞানী রেমণ্ড লিন্ডেম্যান দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাখ্যাকে দশ শতাংশ সূত্র (Law of ten percent) বলা হয়।

লিন্ডেম্যানের দশ শতাংশের সূত্র (Law of ten percent)

প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ ওই পুষ্টিস্তরের জীবদের দেহ গঠনের কাজে লাগে। ওই দেহ থেকেই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের জীবেরা তাদের পুষ্টি পায়।

তোমাদের মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে বাকি প্রায় 90 শতাংশ শক্তি কোথায় গেল?

ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

1. এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, শক্তির একটা অংশ নানান শারীরবৃত্তীয় কাজে খরচ হয়। শক্তির এই অংশটুকু আর পরের পুষ্টিস্তরে পৌঁছোতে পারে না।

2. পুষ্টিস্তরের অন্তর্গত জীবরা মরে যায়। মরার পর পচা গলা মৃতদেহ মাটিতে মিশে গেলে পরবর্তী পুষ্টিস্তরের জীবরা ওই শক্তি ব্যবহার করতে পারে না।

কোন খাদ্য শৃঙ্খলটি ঠিক ও কোনটি ঠিক নয় তা চিহ্নিত করো :

খাদ্য শৃঙ্খল	ঠিক না ভুল
১.১ ধান → ইঁদুর → ময়ূর → সাপ	
১.২ শ্যাওলা → মাছ → ভোঁদড়	
১.৩ ঘাস → ব্যাঙ → গঙ্গাফড়িং → সাপ → বেজি	
১.৪ ঘাস → গঙ্গাফড়িং → ব্যাঙ → সাপ → বেজি	

মনে রাখা জরুরি :

- শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শুধু এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।
- এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, শক্তির একটা অংশ নানান শারীরবৃত্তীয় কাজে খরচ হয়। শক্তির এই অংশটুকু আর পরের পুষ্টিস্তরে পৌঁছোতে পারে না।

তোমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির 'বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

১.১ পোড়াচুনে জল দেওয়ার ফলে পাত্রটি গরম হয়ে উঠল। এখানে শক্তির রূপান্তর হলো— ক) রাসায়নিক শক্তি থেকে থেকে আলোক শক্তি খ) রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি গ) তাপ শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি ঘ) রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি

১.২ নীচের যে ক্ষেত্রে স্পর্শহীন বল প্রযুক্ত হচ্ছে সেটি হলো— ক) একটা বল ক্রিকেট ব্যাটে লেগে ছিটকে যাচ্ছে খ) তুমি হাতে সাবান মাখছ গ) দাঁত ব্রাশ করছ ঘ) পৃথিবীর টানে একটা বল উঁচু থেকে নীচের দিকে নামছে

১.৩ নীচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি ঠিক – ক) ঘাস → গঙ্গাফড়িং → ব্যাং → সাপ → বেজি খ) গাছের পাতা → শালিক পাখি→ পঙ্গপাল গ) গাছের পাতা → বাজ → খরগোশ ঘ) হরিণ → ঘাস → সাপ

১.৪ লিন্ডেম্যানের সূত্রানুসারে প্রত্যেক ট্রফিক স্তরের যত শতাংশ শক্তি পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করে তা হলো— ক) 20 খ) 30 গ) 40 ঘ) 10

২. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ বল (force) বলতে কী বোঝায়?

২.২ কোন কোন ভাবে বল প্রয়োগ করে তুমি একটা স্প্রিংয়ের আকৃতির পরিবর্তন করতে পারো?

২.৩ যদি কোনো ট্রফিক স্তরের 10 শতাংশ শক্তি পরবর্তী স্তরের কাজে লাগে তাহলে বাকি 90 শতাংশ শক্তি কোথায় যায়?

২.৪ সর্বভুক কাদের বলে? দুটি সর্বভুক প্রাণীর উদাহরণ দাও।

৪. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

"একটি ছোটো লোহার টুকরোর স্থান পরিবর্তন করতে হলে স্পর্শ করে ক্রিয়াশীল বল অথবা স্পর্শ-ছাড়া ক্রিয়াশীল বল এই দুটির যে কোনো একটি প্রয়োগ করা যেতে পারে"— যুক্তি দিয়ে বক্তব্যটি সমর্থন করো।

6 মানুষের শরীর

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবস্থান, গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের কাজ আলোচনা করতে পারবে।
- মানুষের ফুসফুসের অবস্থান এবং গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষের অস্থি ও অস্থিসন্ধির প্রাথমিক ধারণা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করতে পারবে।
- মানুষের পেশির অবস্থান ও কাজ আলোচনা করতে পারবে।

হৃৎপিণ্ড

স্টেথোস্কোপ

ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে উনি স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রুগীকে পরীক্ষা করেন। এই স্টেথোস্কোপের সাহায্যে শরীরের ভেতরের নানা শব্দ (যেমন— হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের শব্দ) শুনতে পাওয়া যায়।

স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার

ফ্রান্সে 1816 খ্রীস্টাব্দে রেনে লিনেক (Rene Laennec) স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

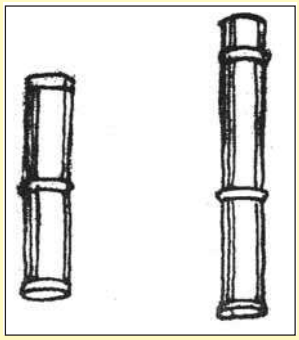

লিনেকের বানানো স্টেথোস্কোপ

→

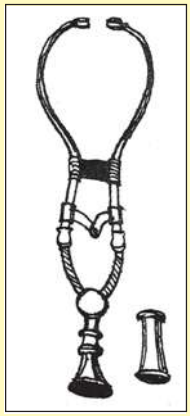

প্রথম দু-নলা স্টেথোস্কোপ

→

আজকের স্টেথোস্কোপ

এসো হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার যন্ত্র বানানো যাক—

- একটা প্লাস্টিকের ফানেল আর একটা পিচবোর্ড বা মোটা রবারের নল নাও।
- পিচবোর্ড বা মোটা রবারের নলটা এমন হতে হবে যা ওই ফানেলটার নলে লাগানো যাবে।
- ফানেলটার সঙ্গে রবারের নলটা আটকে দাও।
- তোমার বানানো যন্ত্রটা দিয়ে বুকে আর পিঠের বিভিন্ন জায়গায় রেখে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার চেষ্টা করো।
- বিশ্রামরত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের যে শব্দ শুনলে, দৌড়ে আসার পর দেখবে হৃৎপিণ্ডের শব্দটা বেড়ে গেছে।

❖ হৃৎপিণ্ডের অবস্থান

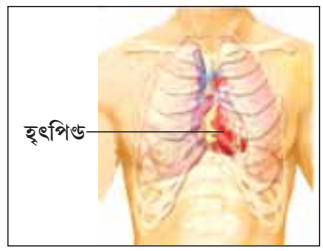

পাশের ছবিতে দেখো, হৃৎপিণ্ড থাকে বুকের মাঝখানে থাকা বক্ষাস্থি ও শিরদাঁড়ার মাঝের অংশে— বক্ষাস্থির ঠিক পেছনে।

❖ হৃৎপিণ্ডের গঠন

- হৃৎপিণ্ড আসলে শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার পাম্প।
- হৃৎপিণ্ড অনেকটা দোতলা বাড়ির মতো দেখতে। যার ওপরতলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। আর নীচের তলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। প্রত্যেকটা ঘর একে অপরের থেকে আলাদা থাকে মেঝে বা দেওয়াল দিয়ে।
- হৃৎপিণ্ডের ওপরের দুটো কুঠুরির নাম **অলিন্দ**। ডানদিকের কুঠুরির নাম ডান অলিন্দ আর বামদিকের কুঠুরির নাম বাম অলিন্দ।
- হৃৎপিণ্ডের নীচের দুটো কুঠুরির নাম **নিলয়**। ডানদিকের কুঠুরির নাম ডান নিলয় আর বামদিকের কুঠুরির নাম বাম নিলয়।

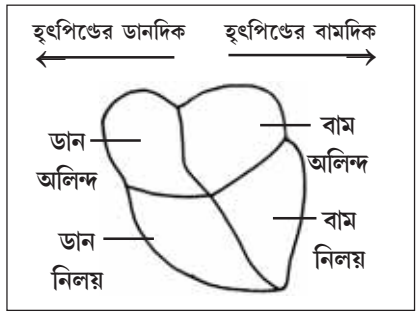

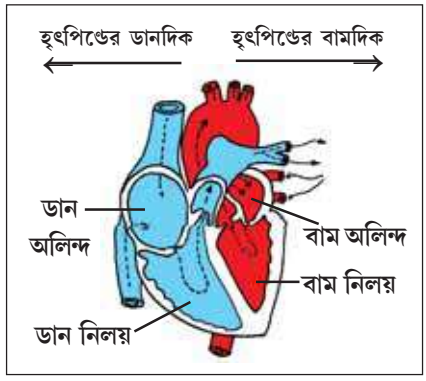

জেনে রাখো

ধমনি : যে নলগুলো দিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সারা দেহে যায়, তারা হলো ধমনি।

শিরা : যে নলগুলো দিয়ে সারা দেহ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, তারা হলো শিরা।

রক্ত

❖ রক্তের দুটি অংশ— রক্তরস ও রক্তকণিকা।

রক্ত

রক্তরস

- রক্তের জলীয় অংশ।
- খাবার হজম হওয়ার পর তৈরি হওয়া ছোটো আকারের কণাগুলো খাদ্যনালি থেকে বয়ে নিয়ে যায়।
- শরীরের নানা জায়গা থেকে তৈরি হওয়া অদরকারি যৌগগুলো (যেমন — CO_2, শরীরে তৈরি হওয়া ক্ষতিকারক যৌগ) বয়ে নিয়ে ফুসফুস, বৃক্ক এসব জায়গায় পৌঁছে দেয়।

রক্তকণিকা

লোহিত রক্তকণিকা

- এমন কণা যা লাল রঙের আর খালি চোখে দেখা যায় না।
- ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে পৌঁছে দেয় শরীরের বিভিন্ন জায়গায়।

শ্বেত রক্তকণিকা

- সাদা, খুব ছোটো কণা যাদের খালি চোখে দেখা যায় না।
- এরা শরীরে রক্ষীর কাজ করে।

অণুচক্রিকা

- রক্তে উপস্থিত একরকমের খুব ছোটো ছোটো কণা।
- শরীরের কোথাও কেটে গেলে এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

মাইক্রোস্কোপ-এর সাহায্যে মানুষের **Blood Film**-এর স্লাইড দেখানো হলো। রক্তের বিভিন্ন ধরনের কোশ চিনতে পারো কি না দেখো। দলে আলোচনা করো। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও। কী দেখতে পেলে তা নীচে লেখো।

রক্তের বিভিন্ন ধরনের কোশ	দেখতে কেমন
লোহিত রক্তকণিকা	
শ্বেত রক্তকণিকা	
অণুচক্রিকা	

ফুসফুস

আমরা যখন শ্বাস নিই তখন নাকের বা মুখের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রথমে পৌঁছোয় গলার ভেতরের দিকে অবস্থিত শ্বাসনালির মধ্যে। কিছুটা নীচে নেমে শ্বাসনালি দুভাগ হয়ে যায়। এদের বলে **ক্লোমশাখা** (bronchus)। এরপর বাতাস পৌঁছোয় বুকের ভেতর থাকা দু-দিকে দুটো বড়ো হাওয়ার ব্যাগের মতো জায়গায়। ওরাই হলো **ফুসফুস**।

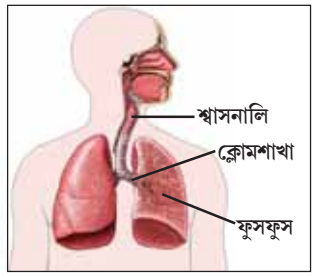

❖ **গঠন**

- ফুসফুসের রং কালচে গোলাপি। কারণ অনেক সরু সরু নালি দিয়ে এর ভেতর রক্ত চলাচল করে।
- শ্বাসনালি যতই ভেতরে ঢোকে তা গাছের ডালপালার মতো অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হতে থাকে।
- সবশেষে থাকে সূক্ষ্ম শ্বাসনালিকা (bronchiole); তারও শেষে থাকে দশ কোটি ছোটো ছোটো বেলুনের মতো বায়ুথলি। শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে এই ছোটো ছোটো বায়ুথলি পর্যন্ত বুকের দু-দিকে থাকা দুটো যন্ত্রের নামই ফুসফুস।

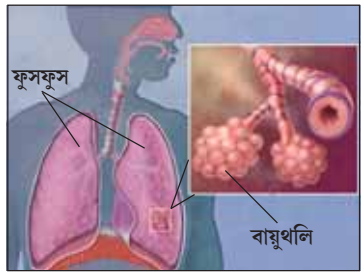

- এক-একটা ফুসফুসে প্রায় দশ কোটি বায়ুথলি থাকে। বায়ুথলির গায়ে রক্তনালি থাকে।
- বাম ফুসফুসে দুটো খণ্ড আর ডান ফুসফুসে তিনটে খণ্ড আছে।

❖ **কাজ**

- বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভেতর টেনে নেওয়া; সেই টেনে নেওয়া বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্তে পৌঁছে দেওয়া; আর শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে টেনে নিয়ে বাতাসের সঙ্গে শরীর থেকে বের করে দেওয়া।

অস্থি

জন্মের সময় একজন শিশুর প্রায় 300টি হাড় বা অস্থির অংশ থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকগুলোই একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে অবশেষে পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে অস্থির সংখ্যা হয় 206টি।

নীচে মানুষের কঙ্কালের ছবি দেওয়া আছে। কঙ্কালের ছবি থেকে কয়েকটা অস্থি চিনে নেওয়া যাক।

❖ **কাজ**

- ♦ মানবদেহের কাঠামো তৈরি করে।
- ♦ হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মতো শরীরের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে রক্ষা করে।
- ♦ দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

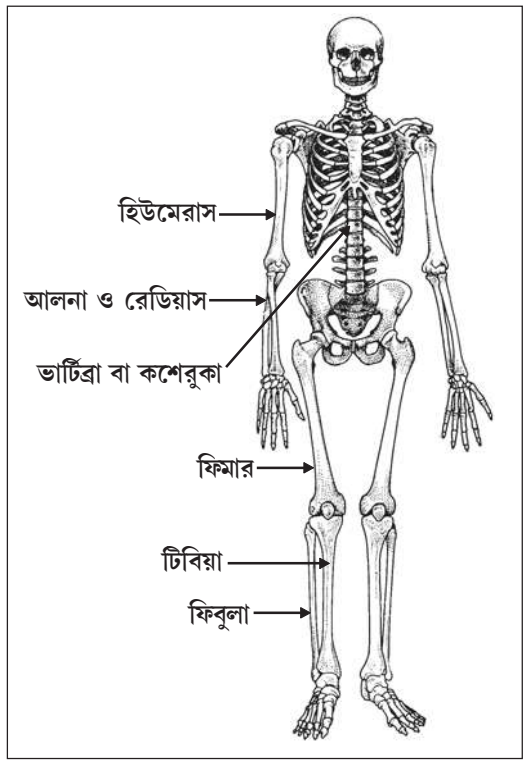

অস্থিসন্ধি

❖ দুটো প্রতিবেশী অস্থি যেখানে একে অপরের সঙ্গে লিগামেন্ট দিয়ে বাঁধা থাকে সেই জায়গাটাকেই বলে **অস্থিসন্ধি** বা হাড়ের জোড়। হাড় হলো অস্থি আর জোড় হলো সন্ধি।

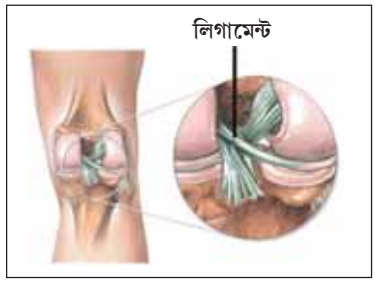

❖ কাঁধ, কোমর, হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধির মাঝখানে একরকম হড়হড়ে তরল থাকে। সেটা কমে গেলে হাড়ের নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

❖ অনেক মাংসপেশি, আবার **টেনডন** নামের স্থিতিস্থাপক আর একধরনের দড়ির মতো জিনিস দিয়ে ওই অস্থিসন্ধিগুলোর সামনে, পেছনে বা যে-কোনো পাশ দিয়েই ওপরের অস্থি ও নীচের অস্থির সঙ্গে বাঁধা থাকে।

অস্থিসন্ধির প্রকারভেদ

অস্থিসন্ধি

- **অচল**
  - মাথার খুলিতে এরকম অস্থিসন্ধি দেখা যায়।
- **ঈষৎ সচল**
  - মেরুদণ্ডে কশেরুকাগুলির মধ্যে এরকম অস্থিসন্ধি দেখা যায়।
- **সচল**
  - **বল এবং সকেট সন্ধি**
  - **হিঞ্জ সন্ধি**
  - **পিভট সন্ধি**
  - **স্যাডল সন্ধি**

এসো এবারে আমাদের কোমরের অস্থিসন্ধি আর হাঁটুর অস্থিসন্ধি সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

♦ **কোমরের অস্থিসন্ধি**

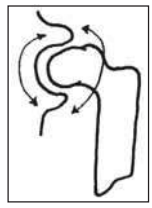

কোমরের অস্থিসন্ধিতে পায়ের ওপরের হাড় বা ফিমারের ওপরদিকটা একটা গোলক বা বলের মতো। সেই অংশটা শ্রোণীচক্রের (Pelvic Girdle) দু-পাশে গাছের কোটরের মতো অংশে ঢুকে থাকে। ফলে কোমর থেকে পায়ের বিচলন সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিকেই হয়; এমনকি তা অনেকটা চরকির মতো ঘোরানো সম্ভব হয়। এই ধরনের অস্থিসন্ধিকে **বল এবং সকেট সন্ধি** বলে। আমাদের কাঁধেও এধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায়।

♦ **হাঁটুর অস্থিসন্ধি**

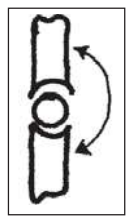

পায়ের ফিমারের সাপেক্ষে হাঁটুর নীচের দুটি লম্বা অস্থি জঙ্ঘাস্থি (Tibia) এবং অনুজঙ্ঘাস্থি (Fibula) কেবল পিছনে ভাঁজ হতে পারে, সামনে নয়। এই ধরনের অস্থিসন্ধিকে **হিঞ্জ সন্ধি** Îÿÿÿ

মনে রাখা জরুরি :

- হৃৎপিণ্ড থাকে বুকের মাঝখানে থাকা বক্ষাস্থি ও শিরদাঁড়ার মাঝের অংশে— বক্ষাস্থির ঠিক পেছনে।
- মানব হৃৎপিণ্ডে চারটি কুঠুরি থাকে — ডান অলিন্দ, বাম অলিন্দ, ডান নিলয় ও বাম নিলয়।
- রক্তের দুটি অংশ — রক্তরস ও রক্তকণিকা।
- ফুসফুসের কাজ হলো বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভেতর টেনে নেওয়া; সেই টেনে নেওয়া বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্তে পৌঁছে দেওয়া; আর শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে টেনে নিয়ে বাতাসের সঙ্গে শরীর থেকে বের করে দেওয়া।
- পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে 206টি অস্থি থাকে।
- কোমরে বল এবং সকেট অস্থিসন্ধি এবং হাঁটুতে হিঞ্জ অস্থিসন্ধি দেখা যায়।
- পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলে কোনো জীবের বা অঙ্গের নড়াচড়া সম্ভব হয়।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'মানুষের শরীর' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

মানুষের শরীরের যেখানে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত সেই জায়গাটি হলো — (ক) বুকের সামনে ডানদিকে (খ) বুকের পেছনে ডানদিকে (গ) বুকের পেছনে বাঁদিকে (ঘ) বক্ষাস্থির ঠিক পেছনে।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ হৃৎপিণ্ডের ওপরের ডানদিকের কুঠুরির নাম ডান _____।

২.২ এক একটা ফুসফুসে প্রায় দশ কোটি _____ থাকে।

২.৩ সচল অস্থিসন্ধিতে দুটো হাড় একে অন্যের সঙ্গে _____ দিয়ে বাঁধা থাকে।

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

রক্তের প্রধান দুটি অংশ কী কী?

৪. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ টেনডনের কাজ কী?

৪.২ রক্তরসের কাজগুলি লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ সংখ্যা হলো — (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪।

১.২ বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় — (ক) হৃৎপিণ্ড (খ) বৃক্ক (গ) ফুসফুস (ঘ) যকৃত।

১.৩ বল ও সকেট সন্ধি দেখা যায় — (ক) হাঁটুতে (খ) মেরুদণ্ডে (গ) কোমরে (ঘ) কব্জিতে।

১.৪ বস্তুর উষ্ণতা মাপার একক হলো— (ক) গ্রাম (খ) কেলভিন (গ) সেকেন্ড (ঘ) মিটার।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ হৃৎপিণ্ডের পেশিকে বলা হয় _____।

২.২ পেশির সঙ্গে অস্থিকে যুক্ত করে _____।

২.৩ SI পদ্ধতিতে বলের একক হলো _____।

২.৪ স্প্রিং তুলার সাহায্যে বস্তুর _____ মাপা হয়।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ রক্তের বেশির ভাগ অংশই হলো জল।

৩.২ অণুচক্রিকা শরীরের আনাচেকানাচে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

৩.৩ বাম ফুসফুস তিনটি খণ্ড নিয়ে গঠিত।

৩.৪ হৃৎপিণ্ডের শব্দ কোনো যন্ত্র ছাড়াও শোনা যায়।

৩.৫ এক বর্গমিটার হলো 10000 বর্গসেন্টিমিটারের সমান।

৩.৬ বস্তুর ওজন মাপা হয় দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে।

৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৪.১ রক্তের কোন উপাদান দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে সাহায্য করে?

৪.২ অচল অস্থিসন্ধি কোথায় দেখা যায়?

৪.৩ SI পদ্ধতিতে আয়তনের একক কী?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ ধমনি ও শিরার পার্থক্য উল্লেখ করো।

৫.২ খাদ্য শৃঙ্খল বলতে কী বোঝায়?

৫.৩ খাদ্যজাল বলতে কী বোঝায়?

৬. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ অস্থির কাজ কী?

৬.২ ফুসফুসের কাজ কী?

৬.৩ শক্তির নিত্যতা বলতে কী বোঝো উদাহরণসহ সংক্ষেপে লেখো।

৬.৪ কয়লায় আবদ্ধ শক্তির মূল উৎস সূর্য — যুক্তিসহ সমর্থন করো।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ইতিহাস

ষষ্ঠ শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

মহঃ মাসুদ আখতার

বিষয় নির্মাণ

অর্পিতা ভাদুড়ি

ড. তন্ময় কুমার ঘোষ

সঞ্চিতা বর্মণ

সমরেন্দ্রনাথ সিনহা

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পাথরের ব্যবহার	১-২
২.	ধাতুর ব্যবহার	৩-৪
৩.	সেকালের ছবি	৫-৬
৪.	নদীতীরের সভ্যতা	৭-৯
৫.	স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সৌধ	১০-১১
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ১	১২-১৩
৬.	ইতিহাস ও পরিবেশ	১৪-১৫
৭.	ইতিহাস ও ভূগোল	১৬-১৭
৮.	ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্থানীয় সংগ্রাম	১৮-১৯
৯.	বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন	২০-২১
১০.	মহাত্মা গান্ধি	২২-২৩
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ২	২৪-২৫
১১.	বাংলায় সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞান সাধনা	২৬-২৮
১২.	সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ	২৯-৩১
১৩.	স্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী	৩২-৩৪
১৪.	সংগ্রহশালা	৩৫-৩৭
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩	৩৮-৩৯
	পঠন সেতুর বিষয় প্রসঙ্গে	৪০

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

পাথরের ব্যবহার

১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পুরোনো দিনের মানুষ কীভাবে পাথরের ব্যবহার শুরু করেছিল, তা বর্ণনা করতে পারবে।
- পাথরের হাতিয়ারের যে বদল ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পাথরের ব্যবহারের সুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাথর মানুষের নানা কাজে লাগে। মানুষ গুহাতে থাকার সময় থেকেই পাথর ব্যবহার করত। হিংস্র পশুর সাথে লড়াই এর সময় চারপাশে পড়ে থাকা পাথরই ছিল তাদের হাতিয়ার। একদিকে পশুদের থেকে আত্মরক্ষা, অন্যদিকে খাদ্যের সন্ধানে পশু শিকার— উভয়ক্ষেত্রেই তারা পাথরের ব্যবহার করত।

পাথর ভেঙে তৈরি মোটামুটি তিনকোণা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি করত হাতকুঠার। আবার পাথরের ধারালো টুকরো দিয়ে মাংস থেকে চামড়া ছাড়াত তারা। পাথরের তৈরি তির বা বর্শার ফলা শিকারে সাহায্য করত। ধিরে ধিরে পাথরের হাতিয়ার আরও হালকা ও ধারালো হলো।

আগুন জ্বালাতে চকমকি পাথর ব্যবহার করত আদিম মানুষেরা। দুটি চকমকি পাথরে ঘষা লাগলে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়। গুহাতে বা জঙ্গলে থাকার সময় মানুষ রাতে আগুন জ্বালাতো হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। শিকার করা পশুর মাংস ঝলসানোর জন্যও তারা আগুনকে কাজে লাগায়।

পাথর দিয়ে তারা ঘরবাড়ি বানাতে শিখেছিল। নানা রঙের সুন্দর পাথরের টুকরো দিয়ে পুরোনো দিনের মানুষ মালা তৈরি করত।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে উপকরণ বা হাতিয়ার বানাতে শিখেছিল। সবচেয়ে পুরোনো হাতিয়ারগুলো পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই হাতিয়ার তৈরি হয়েছে। সেজন্য মানুষের ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল এই পাথরের যুগ।

পাথরের যুগকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। সেই প্রতিটা ভাগে পাথরের হাতিয়ারগুলোর আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আদিম মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের সুবিধায় হাতিয়ারের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হাতিয়ারের বিবর্তনের সাথে সাথে পুরোনো মানুষের জীবনযাপনেও অনেক বদল ঘটেছিল।

পাথরের হাতিয়ার

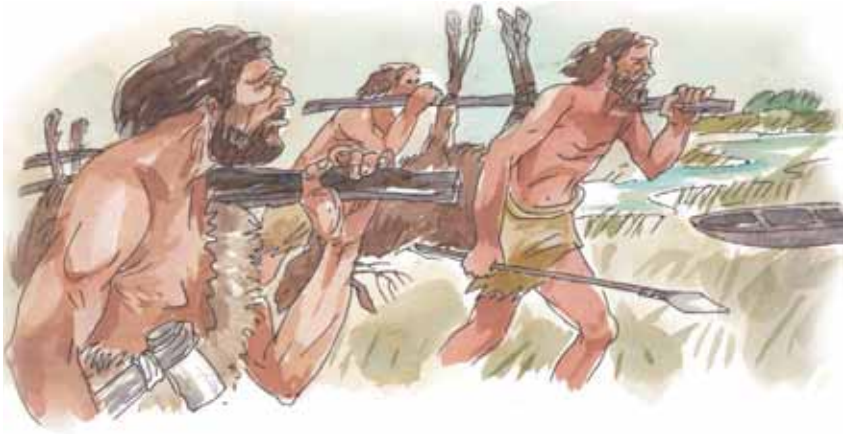

মনে রাখা জরুরি :

- মানুষ গুহাতে থাকার সময় থেকেই পাথরের ব্যবহার শুরু করে।
- আত্মরক্ষা ও পশুশিকারের মাধ্যমে খাদ্যের সংস্থান— দুটি ক্ষেত্রেই পাথর সাহায্য করেছিল।
- পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার মানুষের জীবনে বদল ঘটিয়েছিল।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) তিনকোণা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি হত _____।

(খ) আগুন জ্বালাতে ব্যবহার হত _____।

(গ) পাথরের যুগকে _____ পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) মানুষ নিজের প্রয়োজনে হাতিয়ার বানাত।

(খ) পুরোনো দিনের মানুষ পাথরের তৈরি মালা ব্যবহার করত।

(গ) পুরোনো মানুষের জীবনযাপনে কোন বদল ঘটেনি।

৩. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্য) :

(ক) পাথরের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে কেমন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল লেখো।

(খ) আদিম মানুষ পাথরের ব্যবহার শেখার পর কী কী সুবিধা পেয়েছিল?

ধাতুর ব্যবহার

২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ধাতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ধাতুর ব্যবহারের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে কীভাবে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছ। তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ—এই সমস্ত ধাতুর নাম শুনেছ। ধাতুর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ধাতুকে কোনকিছু দিয়ে আঘাত করলে 'ঠং ঠং' করে আওয়াজ হয়। ধাতু বেশ চকচক করে, আর গরম করলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়।

মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো তামা। তামা দিয়ে তারা খুব দরকারি দুটো জিনিস তৈরি করেছিল। লাঙল আর কাস্তে। তামার পর মানুষ পেয়েছিল ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ হলো তামা আর টিনের মিশ্রণ। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত, অথচ তামার চেয়ে সহজে গলে যায়। এতে মানুষের চাষের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির খুব সুবিধে হলো।

তামা, ব্রোঞ্জের পর একসময় মানুষ লোহার সন্ধান পায়। পৃথিবীতে এসে পড়া উল্কাখণ্ড থেকেই মানুষ লোহাকে খুঁজে পায়। লোহা দিয়ে তৈরি জিনিস আরও শক্ত, ধারালো ও মজবুত। এরফলে মানুষের নানান কাজের সুবিধে হলো। চাষের কাজ আগের থেকে আরও সহজ হলো। লোহার তৈরি ধারালো অস্ত্র দিয়ে জঙ্গল কেটে চাষের জমির পরিমান বাড়ানো হল। চাষের সুবিধে হওয়ায় আগের থেকে বেশি ফসল উৎপাদন হতে লাগল। এরফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। ধীরে ধীরে নতুন নগর গড়ে উঠল।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় মেহেরগড় সভ্যতায়। মেহেরগড়ের মানুষজন তামার ব্যবহার জানত। তামা ও পাথর দুটোরই ব্যবহার হতো বলে এই সময়কে তামা-পাথরের যুগ বলা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার জানত। সেজন্য একে তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাও বলা হয়।

আদি বৈদিক সমাজে তামা দিয়ে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বানানো হত। ঋকবেদ থেকে সোনার নানারকম গয়নার কথা জানা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার শুরু করে। লোহার ব্যবহার কৃষিকাজের সুবিধার পাশাপাশি শাসকদের আরও শক্তিশালী করেছিল।

ধাতুর ব্যবহারের ফলে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের বিবর্তন ঘটে

মনে রাখা জরুরি :

- ধাতুর মধ্যে প্রথম তামার ব্যবহার শিখেছিল মানুষ।
- তামার পর মানুষ ব্রোঞ্জ পেয়েছিল।
- লোহার ব্যবহার শুরু হয় তামা ও ব্রোঞ্জের অনেক পরে।
- ধাতুর ব্যবহারের ফলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরিতে সুবিধে হয়।
- ধাতুর ব্যবহারের ফলে চাষের কাজে গতি আসে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো তামা।

(খ) ব্রোঞ্জ হলো তামা ও লোহার মিশ্রণ।

(গ) ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় মেহেরগড় সভ্যতায়।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) তামা-পাথরের যুগের সভ্যতা হলো _____।

(খ) তামা-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা হল _____।

(গ) ভারতীয় উপমহাদেশে লোহার ব্যবহার শুরু হয় _____।

৩. **নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্য) :**

ধাতুর ব্যবহার মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছিল—ব্যাখ্যা করো।

সেকালের ছবি

৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- গুহার দেওয়ালে ও ছাদে আঁকা ছবির বৈশিষ্ট্য, বিষয়, বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন গুহার নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা নকশা ও ছবির বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

বহুবছর আগে আদিম মানুষেরা পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে, ছাদে নানা ছবি আঁকত। কাঠকয়লার কালি, জন্তুজানোয়ারদের চর্বি মেশানো মাটি দিয়ে ছবি আঁকত তারা।

গাছপালা, প্রকৃতি বা মানুষের ছবি আঁকত। সেই সঙ্গে পশুর ছবি, মানুষের শিকার করার ছবিও তারা আকঁত। তাই পুরোনো অনেক গুহার দেওয়ালে বাইসন, বল্গা হরিণ, ভাল্লুক — এরকম নানা জীবজন্তুর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

গুহার ভেতরে অন্ধকার হওয়ায় ছবি আঁকতে অসুবিধা হত। সেজন্য তারা গুহার ভেতরে কাঠ, খড়কুঠো দিয়ে আগুন জ্বালাত। পরে জন্তুজানোয়ারদের চর্বি জ্বালিয়ে গুহা আলোকিত করত।

মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকায় বেশ কিছু গুহার খোঁজ পাওয়া গেছে। গুহাগুলির দেওয়ালে অনেক পুরোনো সব ছবি আঁকা আছে। বেশিরভাগই শিকারের ছবি। নানারকম বন্য পশুর ছবি রয়েছে। মানুষের সাথে রয়েছে কুকুর। ছবিগুলিতে সবুজ ও হলুদ রং-এর ব্যবহার হলেও বেশি দেখা যায় সাদা এবং লাল রং।

মহারাষ্ট্রের অজন্তা গুহাতেও পুরোনো দিনের ছবি পাওয়া গেছে। ছবিগুলির বেশিরভাগই গুপ্তযুগের। এছাড়া মহারাষ্ট্রের ইলোরা ও মধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহাতেও বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

পাতা, ফুল, গাছপালা ও মানুষের ছবি পাওয়া গেছে অজন্তা গুহাগুলির ভিতরে। বৌদ্ধ কাহিনী-বিশেষত জাতককে আশ্রয় করে অজন্তার ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। ওখানে উজ্জ্বল ও গাঢ় ভেষজ রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে।

ভীমবেটকা গুহাচিত্র

ইলোরা গুহাচিত্র

পাহাড়ের গুহাতে যেমন ছবি আঁকা হত, তেমনি পুরোনো দিনে মাটির পাত্রের গায়েও ছবি আঁকার চল ছিলো। মেহেরগড় সভ্যতার মানুষেরা মাটির পাত্র চুল্লিতে পুড়িয়ে সেগুলোর গায়ে নানারকম নকশা করত ও ছবি আঁকত। হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংশাবশেষ থেকে বেশ কিছু চকচকে লাল পালিশ লাগানো মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলির গায়ে উজ্জ্বল কালো রঙের নকশা আঁকা।

মনে রাখা জরুরি :

- আদিম মানুষেরা পাহাড়ের গুহাতে ছবি আঁকত।
- ছবির বিষয় ছিল গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ ও শিকার প্রভৃতি।
- ভীমবেটকা, অজন্তা, ইলোরা, বাঘ প্রভৃতি গুহাতে পুরোনো দিনের ছবি পাওয়া গেছে।
- পুরোনো দিনে মাটির পাত্রের গায়েও ছবি আঁকা হত।

নমুনা প্রশ্ন

১. উপযুক্ত তথ্য দিয়ে নীচের ছকটি পূরণ করো :

গুহার নাম	অবস্থান	ছবির বিষয় কী ছিলো	ছবির যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য লেখো
ভীমবেটকা			
অজন্তা			

২. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্য) :

(ক) পুরোনো দিনের মানুষেরা ছবি রং করত কীভাবে?

(খ) মাটির পাত্রের গায়ে ছবি আঁকার প্রমাণ কোথায় মিলেছে? সেগুলোর বৈশিষ্ট্য কেমন?

নদীতীরের সভ্যতা

৪

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করেই কেন গড়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নগর সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর দেখতে পাওয়া যায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

পুরোনো যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল কোনো-না-কোনো নদ নদীর ধারে, যেমন সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পা-মহেনজোদাড়ো সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, হোয়াং হো নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা প্রভৃতি। আসলে নদী ছিল তাদের কাছে মায়ের মতো। নদীই নিয়ন্ত্রণ করত তাদের জীবনকে। তাই এইসব সভ্যতাকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়। অনেক সময় নদীর বন্যায় সেখানকার বাসিন্দাদের অনেক ক্ষতি হলেও তারা নদীর ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকত। এখন প্রশ্ন হল নদীকে কেন্দ্র করেই কেন এই সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল? আসলে মানুষ নদীর কাছ থেকে অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা পেত, যেমন ধরো —

- **স্বাস্থ্যকর পানীয় জল** — নদীর জল যেহেতু সবসময় বয়ে যায় সেহেতু এই জলে কোনো নোংরা-আবর্জনা থাকে না। তাই মানুষ অনায়াসে সেই জল পানীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।
- **দৈনন্দিন কাজেও** নদীর জল ব্যবহৃত হয়।
- প্রাচীনকালে নদী **পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ** ছিল। এইপথে অনেক কম সময়ে, কম পরিশ্রমে ভারী ভারী জিনিসপত্র সহজেই আনা-নেওয়া করা যেত।
- **প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা** হিসেবেও নদী খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন না হরপ্পা-মহেনজোদাড়োর মতো নগর সভ্যতাগুলিতেও দেখা যায় নর্দমাগুলির সঙ্গে যোগ ছিল নদীর। আর এই নদীর মাধ্যমেই নোংরা জল বয়ে যেত অন্যত্র।

হরপ্পা সভ্যতার কতগুলি কেন্দ্র

- নদীবাহিত পলি **মাটি খুব উর্বর** হওয়ায় এই মাটিতে ফসলও খুব ভালো হয়। তা ছাড়া সেচের কাজও চলত এই নদীর জল থেকেই।
- আবার **নদী সংলগ্ন এঁটেল মাটি** থেকে ইট তৈরি করা হত। জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিদ্যাধরী নদীর তীরে মাটি খুঁড়ে যে চন্দ্রকেতু রাজার দূর্গ বা গড় পাওয়া গেছে সেখানেও ইটের সন্ধান মিলেছে, যদিও তা অত্যন্ত পাতলা ধরনের ছিল। এছাড়াও এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে নারীমূর্তির সংখ্যা বেশি।

ছবি :
সুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়

ছবি :
পোড়ামাটির ভাস্কর্য,
চন্দ্রকেতুগড়

পুরোনো দিনের আরও কিছু শহরে ইটের তৈরি বাড়ি দেখা যায়। যেমন হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘর। সেগুলো আগুনে পড়ানো ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। ঘর-বাড়ি ছাড়াও পথঘাট বানানো হত এই ইট দিয়েই। শহরে নর্দমার কথা তোমরা আগেই জেনেছো। এই নর্দমাগুলোও ছিল ইট দিয়ে তৈরি। সে সময় জল ধরে রাখার জন্য যে সমস্ত বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা বানানো হত সেগুলিও ছিল ইটের তৈরি।

মনে রাখা জরুরি :

- সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পা-মহেনজোদাড়ো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- নদীবাহিত পলি মাটি উর্বর হওয়ায় ফসল খুব ভালো হয়।
- চন্দ্রকেতু দূর্গ বা গড় বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত।
- ইট ছিল নগর সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) নদীমাতৃক সভ্যতা কাকে বলে?

(খ) চন্দ্রকেতু রাজার দূর্গ কোথায় অবস্থিত?

২. ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :

(ক) নগর সভ্যতায় নর্দমাগুলি মাটির তৈরি ছিল।

(খ) ফসল ভালো হয় অনুর্বর জমিতে।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) হরপ্পা-মহেনজোদাড়ো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল _____ নদের তীরে।

(খ) হরপ্পা সভ্যতার বাড়ি-ঘরগুলি _____ ইট দিয়ে বানানো হত।

(গ) চন্দ্রকেতু গড়ের ইটগুলি ছিল _____।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সৌধ

৫

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সৌধের গঠন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সৌধের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

প্রাচীন নানা শিল্পবস্তু থেকেও ইতিহাসের নানা কিছু জানা যায়। এই শিল্পবস্তুর মধ্যে স্থাপত্য-ভাস্কর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো দিনের বাড়ি, ঘর, প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা অর্থাৎ পুরোনো দিনের সব ইমারতই স্থাপত্য। যেমন- কোনারকের মন্দির, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ।

সৌধও একটা স্থাপত্য। তার সাথে কারও না কারও স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। যেমন মমতাজের স্মৃতিতে বানানো তাজমহল।

পাথর বা অন্য কিছুর গায়ে খোদাই করা নকশা বা মূর্তি ফুটিয়ে তোলাকেই বলা হয় ভাস্কর্য।

বিষ্ণুপুরের মন্দির : মল্ল রাজাদের নামেই একসময় বিষ্ণুপুরের নাম ছিল মল্লভূম। তাঁদের সময় অনেক মন্দির বানানো হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের লাল মাটিতে তৈরি ইট দিয়ে বানানো হয়েছে এই মন্দির। রাসমঞ্চ, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নানা কাজ সত্যিই সুন্দর।

সূর্যমন্দির : কোনারকের সূর্যমন্দির দেখতে একটা বিরাট রথের মতো। রথটিতে বারো জোড়া চাকাও আছে। ভাস্কর্য নিদর্শন হিসেবে মন্দিরের দেওয়ালগুলোতে নানারকম মূর্তি দেখা যায়।

জামা মসজিদ : দিল্লির জামা মসজিদ আকার-আয়োজন বিরাট। বিরাট বিরাট গম্বুজ। সামনে বিরাট বারান্দা। মুঘল সম্রাট শাহজাহান এই মসজিদটি বানিয়েছিলেন।

টিপু সুলতান মসজিদ : কলকাতায় দুটি টিপু সুলতান মসজিদ আছে। দুটি মসজিদ দেখতেও একই রকম। অনেকগুলো গম্বুজ আছে এই মসজিদে। আর আছে মিনার।

ব্যান্ডেল চার্চ : এটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান চার্চ। পোর্তুগিজরা এটি নির্মান করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এটি বানানো হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যগুলো মূলত দু-রকম কাজের জন্য বানানো হতো। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য স্থাপত্য বানানোর চল ছিল। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠত। তাছাড়া ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে বানানো স্থাপত্য।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে অষ্টম অধ্যায় - প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক পড়ার সময় শিল্প বিষয়ে বিস্তারিত জানবে। সেখানে তোমরা মৌর্য আমলের শিল্পচর্চা, সুঙ্গ-কুষাণ-সাতবাহন আমলে শিল্পচর্চা, গুপ্ত আমলের শিল্পচর্চা সম্পর্কে আরও তথ্য পাবে। স্তূপ-চৈত্য-বিহার এর গঠন ও বৈশিষ্ট্য এবং মৌর্য থেকে কুষাণ যুগ পর্যন্ত স্তূপের বিবর্তন সম্পর্কেও জানবে।

মনে রাখা জরুরি :

- অনেক পুরোনো ইমারত স্থাপত্যের নিদর্শন।
- স্থাপত্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য যেমন বানানো হতো, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেও নির্মিত হতো।
- পাথর বা স্থাপত্যের গায়ে খোদাই করা নকশা বা মূর্তিই হলো ভাস্কর্য।
- সৌধ বানানো হতো মূলত কারও স্মৃতিতে।

নমুনা প্রশ্ন

নীচের ছবিগুলোর কোনটা স্থাপত্য ও কোনটা ভাস্কর্য? স্থাপত্যগুলোর মধ্যে কোনগুলো সৌধ? ফাঁকা খোপগুলোতে লেখো।

কুতুবমিনার একটি

☐ নির্দশন

সাঁচী স্তুপের তোরণের গায়ের নকশা ☐ নির্দশন

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একটি ☐ নির্দশন

অশোকস্তম্ভ একটি

☐ নির্দশন

নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :**

(ক) পুরোনো দিনের মানুষেরা কোন কোন কাজে আগুনের ব্যবহার করত?

(খ) পাথরের যুগকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

(গ) মানুষ প্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার শুরু করেছিলো?

(ঘ) ব্রোঞ্জ কীভাবে পাওয়া যায়?

(ঙ) মানুষ লোহার সন্ধান কীভাবে পেয়েছিলো?

(চ) হরপ্পা কোন যুগের সভ্যতা?

(ছ) পুরোনো দিনের মানুষেরা কোন কোন জিনিস দিয়ে ছবি আঁকত?

(জ) কোন জায়গাকে মল্লভূম বলা হত?

(ঝ) কারা ব্যান্ডেল চার্চ নির্মাণ করেছিলেন?

(ঞ) জামা মসজিদটি কে বানিয়েছিলেন?

২. **বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :**

(ক) মানুষ নিজের প্রয়োজনে বানিয়েছিল _____।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান চার্চ _____।

(গ) কোনারকের সূর্যমন্দির দেখতে _____।

(ঘ) টেরাকোটার নানা কাজ দেখা যায় _____।

(ঙ) ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় _____।

(চ) অজন্তা গুহার ছবিগুলির বেশিরভাগই _____।

(ছ) ভীমবেটকা গুহার বেশিরভাগ ছবি _____।

(জ) ব্যান্ডেল চার্চ বানানো হয়েছিল _____।

(ঝ) টিপু সুলতান মসজিদে আছে _____।

(ঞ) মমতাজের স্মৃতিতে বানানো হয়েছিল _____।

৩. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
মিশরীয় সভ্যতা	হোয়াং-হো নদী
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা	সিন্ধু নদ
চৈনিক সভ্যতা	টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী
হরপ্পা সভ্যতা	নীলনদ

৪. **ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) তিনকোণা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি হত হাত-কুঠার।

(খ) পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার শুরু করে।

(গ) মধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহাতে বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

(ঘ) পাথরের গায়ে খোদাই করা নকশা বা মূর্তি স্থাপত্য নিদর্শন।

(ঙ) বিদ্যাধরী নদীর তীরে চন্দ্রকেতু রাজার গড় পাওয়া গেছে।

ইতিহাস ও পরিবেশ

৬

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অরণ্য বা বন সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীতে বসবাস করে, তাকেই পরিবেশ বলে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে; যেমন মাটি, জল, বায়ু, আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, সূর্যের আলো, মানুষজন ইত্যাদি— তা নিয়েই গঠিত হয় আমাদের পরিবেশ। পরিবেশকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়— প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। আমাদের চারপাশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। আর মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে জীবনযাপনের সুবিধার জন্য তার চারপাশে যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাকেই সামাজিক পরিবেশ বলে।

মানবসভ্যতা বিকাশের প্রথম দিন থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়েই সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সভ্যতার শুরুর দিকে ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগটাই ছিল জল আর বনজঙ্গল। ধীরে ধীরে মানুষ চাষ করতে শিখল। তখন প্রয়োজন হল চাষের জমির। গাছ কাটার সুবিধার জন্য ধারালো অস্ত্র বানালো। চাষের জমির প্রয়োজনীয়তা যতই বাড়তে লাগল, বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়তে থাকল। চাষের জমি বাড়াতে গিয়ে বন কমতে লাগল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন থাকার জায়গারও প্রয়োজন হল। তৈরি হল নগর, শহর। গাছ কাটার ফলে শহরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও কমতে লাগল, ফলে শ্বাসকষ্টের মতো নানান অসুখও বাড়তে শুরু করল। শহরে সবুজের অভাবে শুরু হল বৃষ্টিপাতের অভাব। এভাবে প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ যত বেড়েছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ততই নষ্ট হয়েছে। মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে অনেক অনেক গাছ লাগাতে হবে।

পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া মানেই মানবসমাজের ক্ষতি হওয়া। আর তাই, পরিবেশের সঙ্গে মানবসমাজ ও তার ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে তৃতীয় অধ্যায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা (প্রথম পর্যায়) পড়ার সময় হরপ্পা সভ্যতার ক্রমঅবনতি সম্পর্কে জানবে। মহেঞ্জোদাড়ো নগরের বিরাট পাঁচিলটি একই জায়গায় অনেকবার মেরামতির ছাপ দেখা যায়। তাছাড়া পাঁচিলের গায়ে কাদার চিহ্নও পাওয়া গেছে। সিন্ধুনদের বন্যায় মহেঞ্জোদাড়োর ক্ষতি হয়েছিল বলে মনে হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ নাগাদ এশিয়া মহাদেশের অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। ফলে শুষ্ক জলবায়ু দেখা যায়। হরপ্পা সভ্যতার কৃষিব্যবস্থাও সমস্যায় পড়েছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া ইঁট পোড়ানোর জন্য চুল্লিতে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হতো। ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়েছিল।

প্রাকৃতিক সুবিধার ফলে মগধ শেষপর্যন্ত সব থেকে শক্তিশালী মহাজনপদে পরিণত হয়। মগধ রাজ্য নদী ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। এর ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত। মগধ অঞ্চলের বন ও খনি তাকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

উপরের দুটি উদাহরণ থেকে তোমরা দেখতে পাবে একটি সভ্যতার পতনের জন্য যেমন পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, ঠিক তেমনি একটি মহাজনপদের বিকাশেও প্রকৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখা জরুরি :

- মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীতে বসবাস করে, তাই হল পরিবেশ।
- সামাজিক পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।
- পরিবেশের উপর নির্ভর করে সভ্যতার ইতিহাস।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়েই সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলেছে মানুষ।

(খ) মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে অনেক অনেক গাছ লাগাতে হবে।

(গ) সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য পরিবেশের প্রভাব দায়ী ছিল।

(ঘ) প্রাকৃতিক সুবিধার ফলে মগধ বাইরের শত্রুর থেকে রক্ষা পাইনি।

২. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) পরিবেশ বলতে কী বোঝো?

(খ) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা কেন জরুরি?

(গ) ইতিহাস ও পরিবেশ কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত লেখো।

ইতিহাস ও ভূগোল

৭

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- অঞ্চলের তারতম্যে কীভাবে মানুষের জীবনযাত্রার তারতম্য ঘটে, তা বর্ণনা করতে পারবে।

অতীতে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা বা কাহিনির বিবরণ যেখানে পাওয়া যায়, তাকেই আমরা সাধারণভাবে ইতিহাস বলে থাকি। আবার পৃথিবী সম্পর্কিত বর্ণনা বা আলোচনা যেখানে আমরা পেয়ে থাকি, তাই-ই হল ভূগোল। ইতিহাসে যেমন মানুষ বা মানুষের জাবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, একইভাবে ভূগোলেও মানুষের বসবাসের জগত যেমন, দেশ, বসতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা জলবায়ু নিয়ে আলোচনা থাকে। আর তাই, আমরা একথা বলতেই পারি যে, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমাদের সেই দেশের ভূগোল জানতেই হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ সব জায়গার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বিভিন্ন নদ-নদী, তাদের গতিপথ আমাদের জীবনের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর তাই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতেই হয়। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন নদ-নদী আমাদের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা জানি নদীকে কেন্দ্র করেই পুরোনো সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নানাভাবে নদী মানুষের উপকারে আসে। পাশাপাশি নদীর গতিপথের পরিবর্তন, বন্যা, জলোচ্ছাস—এই বিষয়গুলি মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলো হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে, নয়তো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এসেছে। এজন্য আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি আমাদের রাজ্যে জমি বা ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল (দার্জিলিং) বা পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে (পুরুলিয়া) ভূমির ঢাল বেশি থাকায় এসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব কম হয়। আবার গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বা ব-দ্বীপ অঞ্চলে ভূমির ঢাল কম থাকায় এসব অঞ্চলে (হাওড়া, কলকাতা) জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি হয়। আসলে ভূমির ঢাল বেশি হলে পরিবহন সমস্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করতে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। আসলে জল বা পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধার ওপরেই মানুষ তাদের বসতি স্থাপনের জায়গা নির্বাচন করে। আর তাই মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাস বুঝতে গেলে সেই জায়গার ভূগোল সম্পর্কে জানতেই হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিও স্থানভেদে ভিন্ন। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, তরাই অঞ্চল, রাঢ় অঞ্চল বা গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিও অনেকক্ষেত্রে আলাদা হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসও স্থানাভেদে ভিন্ন হয়। পশ্চিববঙ্গের কিছু অঞ্চলের জমির উর্বরতা খুবই বেশি, কিছু অঞ্চলের মাঝারি। আবার এই পশ্চিমবঙ্গেরই কিছু অঞ্চল বেশ অনুর্বর। তাই উর্বর সমভূমি অঞ্চলে অনেক মানুষের জনবসতি খুব সহজেই গড়ে উঠলেও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের অনুর্বর জমিতে ঘন জনবসতি কখনোই গড়ে ওঠেনা। সেই কারণে আমরা বলতেই পারি, ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের কাজকর্মের ইতিহাসেও বৈচিত্র্য আনে।

মনে রাখা জরুরি :

- অতীতের ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস ও পৃথিবী সম্পর্কিত ধারণাকে ভূগোল বলে।
- ভূমির ঢালের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বও ভিন্ন হয়।
- ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের কাজকর্মের ইতিহাসেও বৈচিত্র্য আনে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর :

(ক) ইতিহাস হল _____।

(খ) ভূগোল হল _____।

(গ) ভূমির ঢাল বেশি হলে _____।

২. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চার লাইন) :

(ক) ইতিহাস ও ভূগোল কী সম্পর্কযুক্ত? যুক্তিসহ লেখো।

(খ) নদীর উপস্থিতি মানুষের জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করে বলে তুমি মনে কর।

(গ) অঞ্চলভেদে কেন জনঘনত্বের তারতম্য ঘটে?

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্থানীয় সংগ্রাম

৮

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে কিছু স্মরণীয় মানুষের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
- স্থানীয় স্তরে যেসব সংগ্রামী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্থানীয় সংগ্রামের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই অগস্ট আমাদের দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বহু বছর ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকার পর এদেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আর এই স্বাধীনতা বা মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা মোটেই সহজ ছিল না। ভারতের বহু মানুষ অনেকবছর ধরে লড়াই করার পর, বহু অত্যাচার সহ্য করার পর ভারবর্ষ স্বাধীন হয়। এই দীর্ঘ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন বহু স্থানীয় সাধারণ মানুষ। আজ আমরা স্থানীয় কিছু সংগ্রাম ও কয়েকজন স্থানীয় সংগ্রামীদের অবদান সম্পর্ক আলোচনা করব। অবশ্য এই স্থানীয় সংগ্রামগুলি নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়েও তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

(ক) বিরসা মুণ্ডা :

বিরসা মুণ্ডা

বিরসা মুণ্ডা ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন মুণ্ডা আদিবাসী। ইংরেজ সরকার স্থানীয় মুণ্ডা আদিবাসীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত, তাদের ওপর ব্রিটিশ আইনকানুন জোর করে চাপিয়ে দিত। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের এই ধরনের নানান অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদে বিরসা মুণ্ডা আদিবাসী মুণ্ডাদের সংগঠিত করেন। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার আগে মুণ্ডারা বনভূমিতে বসবাস করত এবং বহুরকম সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের এই বসবাসের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল বলে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডা আদিবাসীরা ইংরেজ ও তাদের দেশীয় সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মুণ্ডা বিদ্রোহের পর বিরসা সহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হন এবং ইংরেজ সরকার বিরসা মুণ্ডাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

(খ) তিতুমির :

তিতুমির ছিলেন বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিতুমির ও তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গী জমিদারদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অত্যাচারী ইংরেজদের দমন করার জন্য বারাসাতের নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। কিন্তু এই বাঁশের কেল্লা ইংরেজদের কামানের আঘাতে ভেঙে যায়। ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তিতুমিরের নেতৃত্বাধীন এই স্থানীয় সংগ্রাম বারাসত বিদ্রোহ নামেও পরিচিত।

(গ) সিধো মূর্মু :

সিধো মূর্মু

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেছিলেন সাঁওতাল উপজাতির মানুষ যা সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন সিধো মূর্মু ও কানহু মূর্মু। ইংরেজরা অন্যায়ভাবে তাদের জমি কেড়ে নিয়েছিল, জঙ্গল কেটে ফেলেছিল। বহুবছর ধরে সাঁওতালরা ইংরেজ কর্মচারী, জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাঁওতালরা তির ধনুক ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বন্ধুক ও কামানের সামনে পরাজিত হন। সিধো, কানহুর মতো সাঁওতাল নেতাদের মৃত্যু হলে এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মনে রাখা জরুরি :

- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্থানীয় আন্দোলনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
- বীরসা মুণ্ডা, তিতুমির ও সিধো মুর্মুর মতো নেতারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন।
- এই সংগ্রামগুলির প্রভাব নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

নমুনা প্রশ্ন

১. স্তম্ভ মেলাও :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
ক) বীরসা মুণ্ডা	১) সাঁওতাল বিদ্রোহ
খ) তিতুমির	২) মুণ্ডা বিদ্রোহ
গ) সিধো মুর্মু	৩) বারাসাত বিদ্রোহ

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল _____ খ্রিস্টাব্দে।

(খ) বীরসা মুণ্ডা ছিলেন একজন _____ আদিবাসী।

(গ) তিতুমির নারিকেলবেড়িয়ায় _____ নির্মাণ করেন।

(ঘ) সাঁওতালরা সংগ্রাম করেছিলেন _____ বিরুদ্ধে।

৩. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) বীরসা মুণ্ডা কে ছিলেন?

(খ) কে, কী উদ্দেশ্যে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?

(গ) সিধো মুর্মু ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে কী জানো?

(ঘ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত স্থানীয় আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য কী ছিল?

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন

৯

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ইংরেজদের কুশাসনের বিরুদ্ধে কেন আর কীভাবে ভারতীয়রা প্রতিবাদ করেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা কী পদক্ষেপ নিয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

ব্রিটিশ শাসিত বাংলার ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বঙ্গভঙ্গ। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। 'বঙ্গভঙ্গ' শব্দটিকে যদি আমরা ভাগ করি, তাহলে হয় 'বঙ্গ ভঙ্গ'। 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ বাংলা আর 'ভঙ্গ' শব্দের অর্থ ভাগ। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ শব্দের অর্থ হল 'বাংলা ভাগ'। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করে পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করাকেই বঙ্গভঙ্গ বলে।

লর্ড কার্জন

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয়দের ওপর নানাধরনের জোর জলুম করতে থাকে। নানান আইনকানুন চাপিয়ে ভারতীয়দের সবরকমভাবে অত্যাচার ও শোষণ করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর পক্ষে ইংরেজদের শাসন মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তারা চাইত দেশের মানুষই দেশের শাসন চালাবে। তাই দেশের মানুষ একজোট হয়ে ইংরেজদের সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আর ইংরেজরা চেয়েছিল এই একজোট হওয়া মানুষকেই আলাদা করতে। লর্ড কার্জন যুক্তি দিয়েছিলেন শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতেই তিনি বাংলা প্রদেশের বৃহৎ অঞ্চলকে দু-ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন।

১৯০৫-১৯১১ খ্রি. বিভাজিত বাংলার মানচিত্র

বাংলার মানুষ কিন্তু এই ভাগাভাগি মেনে নেয়নি। সবাই মিলে প্রতিবাদ করেছিল। আর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলার মানুষ যে আন্দোলন করেছিল তাই-ই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসকদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলার মানুষ বিদেশি জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়। বিদেশি পোশাক ত্যাগ করে চরকা কেটে সুতো বানিয়ে সেই সুতো থেকে নিজেরা কাপড়-জামা বানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। বাংলাভাগের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' — গানটি লেখেন যা এখন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ভারতীয়দের সবরকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় ইংরেজ সরকার। বিভক্ত দুই বাংলা আবার একত্রিত হয়। সফল হয় বাংলার মানুষের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন।

মনে রাখা জরুরি :

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলাভাগের পরিকল্পনা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।
- বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন নামেও পরিচিত।
- ভারতীয়দের সম্মিলিত আন্দোলনের জেরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করেন _____।

(খ) বঙ্গভঙ্গ শব্দের অর্থ_____ ।

(গ) 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' — এই গানটি রচনা করেন _____।

(ঘ) বঙ্গভঙ্গ রদ হয় _____ খ্রিস্টাব্দে।

২. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চার লাইন) :

(ক) বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছিল কেন?

(খ) বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনের যুক্তি কী ছিল?

(গ) বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার মানুষ কী, কী পদক্ষেপ নিয়েছিল?

মহাত্মা গান্ধি

১০

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- গান্ধিজির ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
- গান্ধিজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গান্ধিজির আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ভারত দীর্ঘ সময় ইংরেজদের অধীনে ছিল। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য গান্ধিজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তাঁর অবদান বিরাট। তাই তাঁকে জাতির জনক বলা হয়।

গান্ধিজির পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতেন। এমনকি পরীক্ষার সময় কখনও কোনো সহপাঠীর লেখা দেখে উত্তর লিখতেন না।

গান্ধিজি যখন স্কুলে পড়তেন তখন একদিন তাঁর স্কুলে আসেন এক স্কুল পরিদর্শক। তিনি ছাত্রদের কয়েকটি শব্দের বানান লিখতে দেন। গান্ধিজি একটি শব্দের ঠিক বানান লিখতে পারছিলেন না। তাঁর শিক্ষক সহপাঠীর লেখা দেখে উত্তর লিখতে ইশারা করেন। কিন্তু গান্ধিজি তেমনটি করেননি।

ছোটো থেকেই গান্ধিজির সততা ও সত্যের প্রতি আগ্রহ ছিলো। বড়ো হয়েও তিনি একই পথ অনুসরণ করেন।

কাজের সুবাদে গান্ধিজিকে বেশ কয়েকবছর দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকতে হয়। সেখানে তিনি দেখেছিলেন কালো মানুষদের উপর সাদা মানুষেরা অত্যাচার করে। তিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন এই আন্দোলনে।

গান্ধিজির আন্দোলনে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায় — 'অহিংসা' ও 'সত্যাগ্রহ'। এই দুটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেন। অহিংসা অর্থাৎ কোনরকম হিংসার আশ্রয় না নেওয়া এবং সত্যাগ্রহ বলতে বোঝায় সত্যকে আশ্রয় করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানো।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতেও তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথ বেছে নেন। বিহারের চম্পারন ও গুজরাটের খেড়াতে কৃষক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। আমেদাবাদের শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি তাদের পাশে দাঁড়ান।

রাওলাট সত্যাগ্রহ ছিল গান্ধিজির প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন। এরপর তিনি একে একে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারতছাড়ো আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। গান্ধিজি দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে আন্দোলনে সামিল করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধিজি মনে করতেন ধর্ম, জাতপাত, সম্প্রদায়, গায়ের রং — কোনো কিছু দিয়েই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়। গান্ধিজি চেয়েছিলেন দেশের সমস্ত মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে মিলেমিশে থাকুক।

কবিগুরু গান্ধিজিকে 'মহাত্মাজি' বলতেন। গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও মহাত্মাকে খুব সম্মান করতেন।

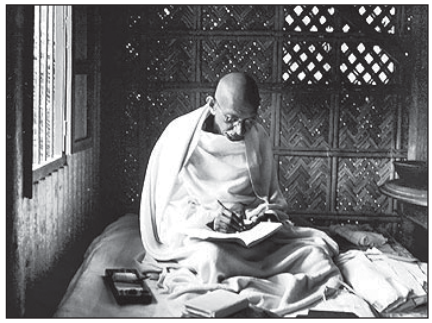
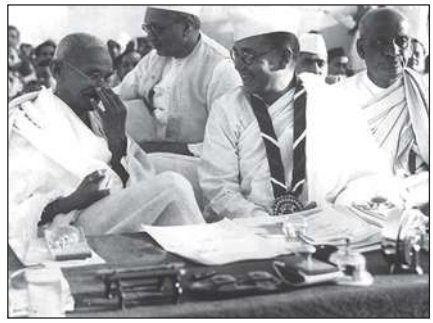

মনে রাখা জরুরি :

- গান্ধিজির সততা ও সত্যের প্রতি আগ্রহ ছিলো ছোটো থেকেই।
- গান্ধিজি অহিংসার কথা বলতেন।
- গান্ধিজি ভারতের সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন।
- গান্ধিজির আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতার পথ তৈরি করেছিল।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) জাতির জনক বলা হয় _____।

(খ) গান্ধিজিকে 'মহাত্মাজি' বলতেন _____।

(গ) গান্ধি পরিচালিত আন্দোলনের দুটি আদর্শ ছিল _____ ও _____ ।

২. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো :

(ক) চম্পারনের কৃষক আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন।

(খ) গান্ধিজি দক্ষিণ-আফ্রিকাতে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

(গ) গান্ধিজি চেয়েছিলেন দেশের সব মানুষ মিলেমিশে থাকুক।

৩. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) গান্ধিজির চারিত্রিক গুণাবলির পরিচয় দাও।

(খ) 'অহিংসা' ও 'সত্যাগ্রহ' বলতে কী বোঝো?

নমুনা প্রশ্নপত্র -২

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :**

(ক) মুণ্ডারা কেন বিদ্রোহ করেছিল?

(খ) সাঁওতাল বিদ্রোহে কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল?

(গ) কত খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল?

(ঘ) ইংরেজরা কেন বাংলাকে ভাগ করতে চেয়েছিল?

(ঙ) গান্ধিজির আন্দোলনের দুটি আদর্শ কি কি?

(চ) কোন বছর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়?

(ছ) গান্ধিজি প্রথম কোন সর্বভারতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

(জ) স্বদেশি আন্দোলন কি?

(ঝ) গান্ধিজি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম কোথায় শুরু করেছিলেন?

(ঞ) সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝ?

২. **বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :**

(ক) ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুন্ডাদের সংগঠিত করেন _____ ।

(খ) বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন _____।

(গ) গুজরাটের খেড়াতে _____ নেতৃত্ব দেন গান্ধিজি।

(ঘ) আমেদাবাদের _____ নেতৃত্ব দিয়েছিলে মহাত্মা।

(ঙ) গান্ধিজির পুরো নাম _____ ।

৩. **ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :**

(ক) মুন্ডারা ইংরেজ ও তাদের দেশীয় সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

(খ) ইংরেজরা অন্যায়ভাবে সাঁওতালদের জমি কেড়ে নিয়েছিল।

(গ) তিতুমির জমিদারের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

(ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন পরিচালনা করেন নেতাজি।

(ঙ) গান্ধিজি বলতেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।

৪. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	**খ-স্তম্ভ**
বঙ্গভঙ্গ	গান্ধিজি
বারাসাত বিদ্রোহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অহিংসা ও সত্যাগ্রহ	তিতুমির
কবিগুরু	লর্ড কার্জন

বাংলায় সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞান সাধনা

১১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- যেসব বিখ্যাত মানুষ ভারতীয় সাহিত্যেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নানান অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলামের মতো সাহিত্যিকদের লেখায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। বাংলার বিশেষ কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানচর্চাকে পথ দেখিয়েছে।

(ক) সাহিত্যিক :

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ – ১৮৯৪)	● বিখ্যাত সাহিত্যিক ● বিখ্যাত উপন্যাস — আনন্দমঠ, রাজসিংহ ● ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেন ● তাঁর লেখা 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে পরিনত হয়েছিল	
(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ – ১৯৪১)	● 'কবিগুরু', 'বিশ্বকবি' নামে পরিচিত ● বিখ্যাত উপন্যাস—গোরা, ঘরে বাইরে ● বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রচনা করেন ● স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি সকলকে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন	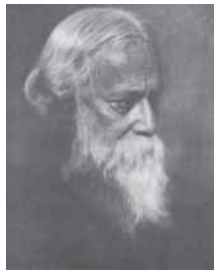
(৩) কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ – ১৯৭৬)	● বিখ্যাত কবি, গীতিকার ও সুরকার ● বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—অগ্নিবীণা ● 'বিদ্রোহী কবি' নামে সুপরিচিত ● ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোর জন্য তাঁকে কারাগারেও যেতে হয়েছে	

(খ) বিজ্ঞানী ও শিক্ষক :

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(১) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮ – ১৯৩৭)	● বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ● প্রাণীদের মতো উদ্ভিদ দেহেও প্রাণ আছে– এই তথ্য আবিষ্কার করেন ● বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন	
(২) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১ – ১৯৪৪)	● বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষক ● বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন	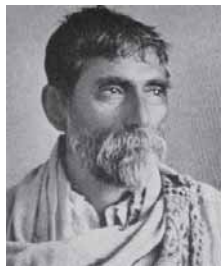
(৩) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩ – ১৯৭২)	● বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ● সংখ্যাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন	
(৪) মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩ – ১৯৫৬)	● বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ● সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন	
(৫) আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪ – ১৯৭৪)	● বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ● ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন	

মনে রাখা জরুরি :

- বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলামের লেখা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বাংলাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে।
- জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের বিজ্ঞান গবেষণা আধুনিক বিজ্ঞানকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন

১. স্তম্ভ মেলাও :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
বসু বিজ্ঞান মন্দির	মেঘনাদ সাহা
বেঙ্গল কেমিক্যালস	জগদীশচন্দ্র বসু
সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স	প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) আনন্দমঠ উপন্যাসটি লেখেন _____।

(খ) 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন _____।

(গ) অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থটি _____ রচনা।

(ঘ) 'উদ্ভিদদেহেও প্রাণ আছে' প্রমাণ করেন _____।

(ঙ) বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন _____।

৩. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চার লাইন) :

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেন বিখ্যাত?

(গ) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কেন স্মরণীয়?

সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ

১২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কারের উদ্যোগগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বাংলার সমাজ সংস্কারকদের উদ্যোগগুলির বিশ্লেষণ করতে পারবে।

উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কারের নানা উদ্যোগ দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল। রামমোহন রায়, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগরের মতো ব্যাক্তিদের অবদান এক্ষেত্রে চিরস্মরণীয়।

সমাজ সংস্কারক :

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(১) রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/মতান্তরে ১৭৭৪ – ১৮৩৩)	● ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' নামে পরিচিত ● বিখ্যাত সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক ● 'সতীদাহ প্রথা' দূরীকরণের জন্য আন্দোলন করেন ● ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথপ্রদর্শক	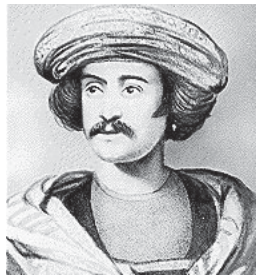
(২) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯ – ১৯৩১)	● বিশিষ্ট কবি, যুক্তিবাদী, চিন্তাবিদ ও শিক্ষক ● কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক ● যুক্তিবাদী ডিরোজিও হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ● তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রদল নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত	
(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)	● বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক ● শিশুপাঠ্য, অনুবাদ ও অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন ● নারী শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ● অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ● বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের পক্ষে আন্দোলন করেন	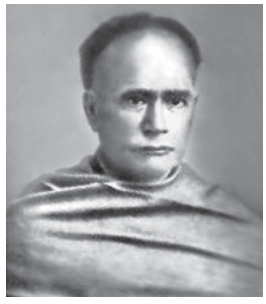

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(৪) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)	• বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক, দার্শনিক ও বিখ্যাত লেখক • শিকাগো ধর্মসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন • দেশের মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন • শুধু লেখাপড়ায়, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন	
(৫) ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)	• বিশিষ্ট লেখক, সমাজসংস্কারক ও সেবিকা • নিজের জীবনের পরোয়া না করে প্লেগরোগীদের সেবা করেন • বিভিন্ন রকম মানবকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন	
(৬) বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)	• বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক • মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন • অনেক ছোটোগল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি লেখেন	

মনে রাখা জরুরি :

- সতীদাহ প্রথা দূরীকরণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন রামমোহন রায়।
- বিধবাবিবাহের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর।
- যুক্তিবাদী ডিরোজিও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।
- দেশের মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ।
- বিভিন্ন রকম মানবকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।
- মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন বেগম রোকেয়া।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভারতের ‘প্রথম আধুনিক মানুষ’ নামে পরিচিত _____।

(খ) ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রদল _____ নামে পরিচিত।

(গ) বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন _____।

(ঘ) ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন _____।

২. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো :

(ক) ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথ পদর্শক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

(খ) অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর।

(গ) নিজের জীবনের পরোয়া না করে প্লেগরোগীদের সেবা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

(ঘ) মেয়েদের পড়াশোনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

স্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী

১৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে হারিয়ে বাংলা তথা ভারতে শাসন ক্ষমতা দখল করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির শাসন ও শোষনের প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতীয়রা বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন তাদেরকে আমরা এখনও স্মরণ করি।

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(১) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৮৬৯ – ১৯৪৮)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● সাধারণ মানুষকে একজোট করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন ● অহিংস ও সত্যাগ্রহের পথ দেখিয়েছিলেন	
(২) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭ –)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন ● ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন— 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'	
(৩) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) (১৮৭৯ – ১৯১৫)	● বিশিষ্ট ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী নেতা ● ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ● বুড়িবালামের তিরে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন	
(৪) ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯ – ১৯০৮)	● বিশিষ্ট বাঙালি বিপ্লবী ● দেশের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন	

নাম	পরিচয় ও অবদান	ছবি
(৫) সূর্য সেন (মাস্টারদা) (১৮৯৪ – ১৯৩৪)	● ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ● চট্টোগ্রামে সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন	
(৬) ভগৎ সিং (১৯০৭ – ১৯৩১)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন	
(৭) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১ – ১৯৩২)	● বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ● ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন	
(৮) কল্পনা দত্ত (১৯১৩ – ১৯৯৫)	● ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ● ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন	
(৯) মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৬৯/মতান্তর (১৮৭০ – ১৯৪২)	● 'গান্ধিবুড়ি' নামে পরিচিত ● গান্ধিজির মতোই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি ● অসংখ্য মানুষকে একজোট করে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইকে শক্তিশালী করে তোলেন	

এঁরা ছাড়াও প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এঁদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী লড়াই করেছিলেন।
- অনেকে দেশের জন্য প্রাণও দিয়েছেন।
- স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও বলিদানের জন্যই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) অহিংস ও সত্যাগ্রহের পথ দেখিয়েছিলেন _____।

(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন _____।

(গ) চট্টোগ্রামে সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন _____।

(ঘ) গান্ধিজির মতোই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন _____।

২. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) সাধারণ মানুষকে একজোট করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন গান্ধিজি।

(খ) ‘গান্ধিবুড়ি’ নামে পরিচিত মাতঙ্গিনী হাজরা।

(গ) বুড়িবালামের তিরে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন বাঘা যতীন।

(ঘ) ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’—বলেছিলেন ভগৎ সিং।

সংগ্রহশালা

১৪

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- কোন ধরনের সংগ্রহশালাতে কেমন সামগ্রি প্রদর্শিত হয় তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।

সাধারণ অর্থে জাদুঘর বা মিউজিয়াম বলতে বোঝায় পুরোনো জিনিসের সংগ্রহশালা। সব সংগ্রহশালা অবশ্য পুরোনো জিনিস দিয়ে হয় না। এখনকার ব্যবহার করা জিনিস দিয়েও সংগ্রহশালা তৈরি করা যায়। বিজ্ঞানের জিনিসপত্র জোগাড় করে সংগ্রহশালা তৈরি করা যায়। আবার নামকরা মানুষদের লেখাপত্র, ব্যবহার করা জিনিসপত্র দিয়েও সংগ্রহশালা হয়।

বিরসা মুণ্ডা জাদুঘর :

রাঁচিতে বিরসা মুণ্ডার নামে একটি মিউজিয়াম আছে। সেখানে ওই অঞ্চলের পুরোনো মানুষের ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র রাখা আছে। মাছ ধরার নানা জাল, নানা ধরনের ছুরি, কাটারি, কাস্তে, আদিবাসী মেয়েদের গয়নাগাটি, পোষাক, বাসনপত্র সেখানে আছে।

ভারতীয় জাদুঘর :

কলকাতায় আছে আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরোনো জাদুঘর। নাম ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভারতীয় জাদুঘর। এখানে অনেক পুরোনো জিনিসের সংগ্রহ আছে। প্রাচীন মিশরের মমিও তোমরা দেখতে পাবে ভারতীয় জাদুঘরে গেলে।

ভ্রাম্যমান জাদুঘর :

তোমরা দেখে থাকবে বাস বা অন্য কোনো বড়ো গাড়িতেও সংগ্রহশালা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সামগ্রি বা ছবি প্রদর্শন করা হয়। অথবা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির লেখাপত্র বা ব্যবহার করা জিনিসপত্রও সংগ্রহের তালিকাতে থাকে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ভারতীয় রেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

নীচে পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি সংগ্রহশালা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র

জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা অরণ্যের মাঝে এই সংগ্রহশালা। ভুটানের রাজার সঙ্গে কোচবিহারের রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। এই সংগ্রহশালার দেয়ালে সেই যুদ্ধের ছবি আঁকা আছে। নানাধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। নানাধরনের পশু-পাখির মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে রাখা আছে। এই পশু ও পাখিদের দেখলে বক্সা জঙ্গল সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়।

নয়া-পিংলার পটচিত্র সংগ্রহশালা

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা গ্রাম। রংবেরঙের পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত। কাপড়ে বা কাগজের ওপর নানা রঙের ছবি আঁকা। ঘরে ঘরে নানা পটচিত্র রাখা আছে। কিছু কিছু পটচিত্র বেশ পুরোনো।

লেপচা মিউজিয়াম

দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ আছে লেপচা মিউজিয়াম। সেখানে নানাধরনের লেখা পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আর আছে পুরোনো দিনের মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র।

গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর

উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে রয়েছে এই সংগ্রহশালা। মহাত্মা গান্ধির ব্যবহার করা জিনিসপত্র এখানে রয়েছে। তাছাড়া অনেকরকম বইপত্র, নানা ধরনের মূর্তি ও ছবি রয়েছে এই সংগ্রহশালায়।

দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্র

এই বিজ্ঞানকেন্দ্রে রয়েছে আকাশ দেখার ব্যবস্থা। সামুদ্রিক নানা মাছ জীবন্ত অবস্থায় রাখা আছে কাচের বাক্সে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মডেল রয়েছে এখানে। এগুলো দেখে বেশ সহজ লাগে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো। বেশ মজা করে বোঝা যায়, জানা যায়। এছাড়া বর্ধমান, পুরুলিয়াতেও বিজ্ঞানকেন্দ্র রয়েছে।

বিড়লা শিল্প-কারিগরি সংগ্রহশালা

কলকাতায় এই সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। এটি পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো বিজ্ঞান মিউজিয়াম। বহু রকমের যন্ত্রপাতির নমুনা রাখা হয়েছে। সেগুলো কীভাবে কাজ করে তাও নানান ছবি ও মডেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে একটি নকল কয়লার খনি রয়েছে। সেটা একেবারে আসল কয়লাখনির আদলে গড়া।

গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম

কলকাতা থেকে খানিক দূরে ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রাম। সেখানে ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের নামে একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। বাংলার লোকশিল্পের নানা জিনিসপত্র রাখা আছে এই সংগ্রহশালায়।

মনে রাখা জরুরি :

- জাদুঘর বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় পুরোনো জিনিসের সংগ্রহশালা।
- সব সংগ্রহশালা শুধু পুরোনো জিনিস দিয়ে হয় না।
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি, শিল্প জন্য, কারিগরি যন্ত্র, মডেল, ছবি প্রকৃতিও সংগ্রহশালায় প্রদর্শন করা হয়।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) বিরসা মুণ্ডা মিউজিয়াম অবস্থিত _____।

(খ) আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরোনো জাদুঘর _____।

(গ) লেপচা মিউজিয়ামে আছে _____।

২. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো :

(ক) পিংলার রংবেরঙের পটচিত্র খুব জনপ্রিয়।

(খ) পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো বিজ্ঞান মিউজিয়াম বিড়লা সংগ্রহশালা।

(গ) গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে নানাধরনের পশুপাখির ও উদ্ভিদ রয়েছে।

৩. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্যে) :

দুটি সংগ্রহশালার নাম লেখো। সেখানে কোন কোন জিনিস আছে লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেন স্মরণীয়?

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি উপন্যাসের নাম লেখো।

(গ) ডিরোজিও কে ছিলেন?

(ঘ) কে প্রমাণ করেন উদ্ভিদ দেহেও প্রাণ আছে?

(ঙ) জাদুঘর কী?

(চ) গান্ধি স্মারক সংগ্রহশালায় কী কী রয়েছে?

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত _____ ।

(খ) ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' নামে পরিচিত _____।

(গ) দেশের মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন _____ ।

(ঘ) বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(ঙ) চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন _____ ।

(চ) পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো বিজ্ঞান মিউজিয়াম _____ ।

৩. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো :

(ক) সতীদাহ প্রথা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বিদ্যাসাগর।

(খ) বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন রামমোহন রায়।

(গ) মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

(ঘ) ভারতীয় জাদুঘর আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরোনো জাদুঘর।

(ঙ) কালিম্পং-এ আছে লেপচা মিউজিয়াম।

(চ) হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও।

৪. **নীচে দেওয়া তথ্যগুলির সাহায্যে ছকটি পূরণ করো :**

সংগ্রহশালা	সংগ্রহ
দিঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র	
গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম	
বিরসা মুণ্ডা জাদুঘর	
রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র	

সূত্র : আদিবাসী মেয়েদের গয়নাগাটি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মডেল, ভুটান ও কোচবিহারের রাজার মধ্যে যুদ্ধের ছবি, বাংলার লোকশিল্পের নানা জিনিসপত্র

পঠন সেতু-র বিষয় প্রসঙ্গে

- ষষ্ঠ শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালটিতে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অনেকগুলি বিষয়কে নেওয়া হয়েছে।
- চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে ষষ্ঠ শ্রেণির মিল থাকায় সেই বিষয়গুলি সংযুক্ত করে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ভাবনা স্থান পেয়েছে — সংযোগরক্ষাকারী বিষয় ও মৌলিক বিষয়।
- এক্ষেত্রে অবশ্য মৌলিক বিষয়ের সংখ্যাই বেশি।
- পাথরের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার, সেকালের ছবি, নদীতীরের সভ্যতা, স্থাপত্য ভাস্কর্য সৌধ—এগুলি সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে।
- ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্থানীয় সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধি, সংগ্রহশালা প্রভৃতি বিষয়গুলি মৌলিক বিষয় হিসেবে পঠন সেতুতে স্থান পেয়েছে।
- নমুনা প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কথা ভেবে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রশ্নের ধরনকে সরাসরি অনুসরণ করা হয়নি।

পঠন সেতু

পরিবেশ ও ভূগোল

ষষ্ঠ শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

অনিন্দিতা দে

বিষয় নির্মাণ

সুরজিৎ ভট্টাচার্য

সৌভিক ভট্টাচার্য

অম্লান মজুমদার

সুমন কুমার মাইতি

সোমা রায়

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
1.	আকাশে কত কিছু	1
2.	পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা কোথায়	7
3.	পৃথিবীর আকৃতি ও আবর্তন	11
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	15
4.	বাতাস-মাটি-জল	17
5.	আবহাওয়া-জলবায়ুর ভিত্তি	22
6.	বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের সংক্ষিপ্ত ধারণা	26
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	31
7.	ভারতের সাধারণ পরিচিতি	33

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 আকাশে কত কিছু

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মহাকাশের বিস্তার এবং তাতে ছায়াপথ ও নক্ষত্রেরা কিভাবে বণ্টিত হয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারবে।
- সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণগ্রাস ও খণ্ডগ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জোয়ার ভাটার সময় মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ারের অবস্থা তুলনা করতে পারবে।

ছায়াপথ, নীহারিকা, নক্ষত্র

'আ' শব্দের মানে 'সব জায়গায় বা পুরোটা জুড়ে উপস্থিত আছে এমন'। 'কাশ' কথাটা এসেছে 'প্রকাশ পাওয়া' থেকে, অর্থাৎ 'সমস্ত জায়গায় যা প্রকাশিত হয়ে আছে'। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিনের বেলা যখন আমরা দেখি বিরাট নীল একটা চাঁদোয়া গোল হয়ে আমাদের ঘিরে আছে, অথবা রাতের বেলা সেই চাঁদোয়াটাই যখন কালো একটা চাদরের মতো সমস্ত দিক ছেয়ে ফেলে, তখনই যেন 'আকাশ' কথাটার মানে ঠিকঠাক বোঝা যায়।

নক্ষত্র ➪ রাতের আকাশে যারা জ্বলজ্বল করে, তারা হলো নক্ষত্র, প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাস আর তরলের ঘুরতে থাকা এক একটা পিণ্ড। আমাদের থেকে অনেক দূরে আছে বলেই সুবিশাল পিণ্ডগুলোকে একেবারে বিন্দুর মতো ছোটো দেখায়। সূর্যও একটা নক্ষত্র। তোমরা জানো, আমাদের পৃথিবী সহ মোট আটটা গ্রহ, পাঁচটা বামন গ্রহ, অনেকগুলো উপগ্রহ, গ্রহাণু আর ধূমকেতু এই সূর্যকে ঘিরেই পরিক্রমা করছে। দূরের নক্ষত্রগুলোরও অনেকেরই আছে নিজস্ব গ্রহ পরিবার। তবে সেগুলিতে কোথাও পৃথিবীর মতো প্রাণ আছে কি না — তা আমরা এখনো জানি না।

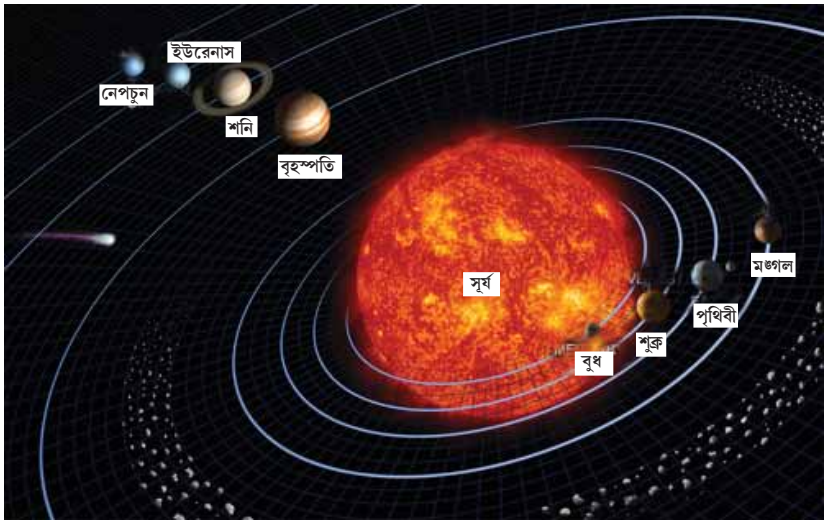

সৌরপরিবারে কোন গ্রহ কোথায় আছে

ছায়াপথ ➪ নক্ষত্রগুলো মহাকাশে এক-এক জায়গায় জোট বেঁধে থাকে। এই জোট বা গুচ্ছগুলোকে বলে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীদের অনুমান সমগ্র মহাবিশ্বে ছায়াপথ আছে প্রায় দুই লক্ষ কোটি। এক একটি ছায়াপথে আছে গড়ে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্রের ভিতরে আবার গড় দূরত্ব হলো নয় হাজার কোটি কিমিরও বেশি। তাহলে এবার ভাবো আমাদের এই মহাকাশ কতটা বিশাল!

রাতের তারাভর্তি আকাশে ভালো করে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে বোঝা যায়, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সাদা ছায়াঘেরা একটা রাস্তা যেন চলে গিয়েছে। আসলে বহুদূরের অনেক তারার আলো ওখানে মিলেমিশে রয়েছে। তাই ধোঁয়ার মতো বা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। পথের মতো দীর্ঘ ছায়াময় এই অংশকে সেইজন্যই বলে ছায়াপথ। আমাদের সূর্য যে বিশাল চরকির

মতো দেখতে ছায়াপথটিতে রয়েছে, তার একখানা বাহুকেই আমরা এইভাবে সাদা একটা পথের মতো দেখি। ইংরেজিতে তাই এর নাম মিল্কিওয়ে (Milky Way), বাংলায় বলে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ। এই ছায়াপথে আছে প্রায় দশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার কোটি নক্ষত্র। তারই একটি হলো আমাদের সূর্য। সূর্যের সবথেকে কাছে যে নক্ষত্র, তার নাম প্রক্সিমা সেনটাউরি। এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিমি অর্থাৎ আলোর গতিতে গেলেও সেখানে পৌঁছতে চার বছরেরও বেশি সময় লেগে যাবে!

বিশেষ কথা

দেবদেবীদের নিয়ে পৌরাণিক গল্প সব দেশেই শোনা যায়। বেশিরভাগ গ্রহ-তারার নাম গ্রিক দেবতাদের নামে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষক গল্প। গল্পগুলি জানতে পারলে আকাশ চিনতে তোমাদের আরো ভালো লাগবে।

সৌরপরিবারের অদ্ভুত সদস্য 'ধূমকেতু' : 'ধূম' মানে 'ধোঁয়া' এবং 'কেতু' মানে 'পতাকা' অর্থাৎ, যে তারার পিছনে ধোঁয়ার মত একটি পতাকা আছে। এরা যখন সূর্যের কাছে আসে, তখনই ঐ পতাকা সৃষ্টি হয়।

মহাকাশের কুয়াশা 'নীহারিকা' : 'নীহার' মানে তুষারপুঞ্জ। 'ইকা' কথাটা বসে কোনো কিছুর ক্ষুদ্র সংস্করণ বোঝাতে। তাই নীহারিকা মানে হলো 'অতি ক্ষুদ্র তুষারকণিকার পুঞ্জ'। রাতের আকাশে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ছায়াপথ ছাড়াও সুবিস্তৃত সাদা পুঞ্জের মতো একে দেখা যায়।

✸ **'ধূমকেতু' নামের মানে হলো 'লম্বা চুলওয়ালা তারা'। তাহলে কেমন দেখতে হয় একটা ধূমকেতু — আন্দাজ করে এঁকে ফেলো তো!**

✸ **নীচের ছকে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো।**

মহাকাশ
↓
ছায়াপথ
↓
[ ]
↓
নক্ষত্র
↓
[ ]
↓
উপগ্রহ

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

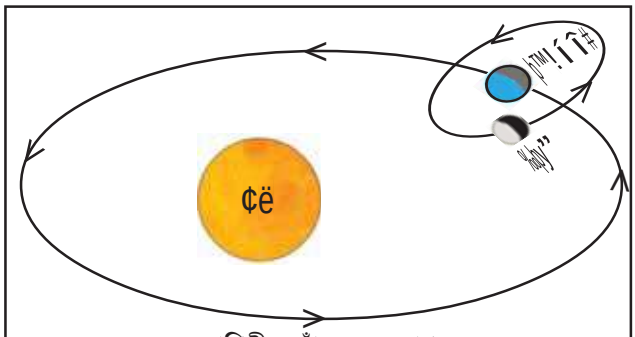

পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ

চাঁদ পরিক্রমা করে পৃথিবীকে ঘিরে এবং পৃথিবী পরিক্রমা করে সূর্যকে ঘিরে। পাশের ছবিতে এই পরিক্রমা করার ঘটনাটা দেখে নাও।

ছবিটাতে সূর্য থেকে একটা সরলরেখা পৃথিবী পর্যন্ত টেনে আরেকটু বাড়িয়ে দাও। চাঁদ যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে পরিক্রমা করছে, তাই সে একবার এই সরলরেখার এক প্রান্তে থাকবে, আরেকবার চলে আসবে সরলরেখাটির মাঝখানে। যখন চাঁদ এক প্রান্তে থাকবে, তখন সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী যেভাবে অবস্থান করবে —

সূর্য — পৃথিবী — চাঁদ

এই অবস্থায় ‘পূর্ণিমা’ হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৃত্তাকৃতির চাঁদ আমরা সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত দেখতে পাই। আবার চাঁদ যখন সরলরেখাটির মাঝখানে থাকবে, তখন সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী যেভাবে অবস্থান করবে —

সূর্য — চাঁদ — পৃথিবী

এই অবস্থায় ‘অমাবস্যা’ হয়, অর্থাৎ রাতের আকাশে চাঁদকে দেখা যায় না।

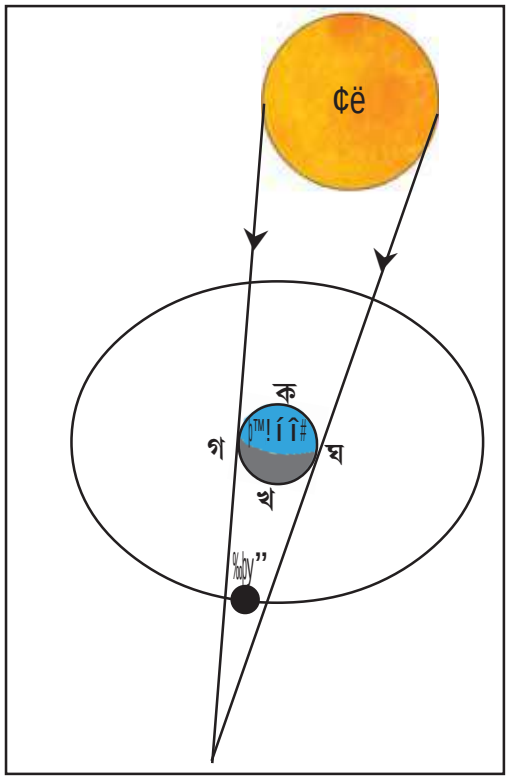

এবার পাশের ছবিটা দেখো। এটা পূর্ণিমার পরিস্থিতি। সূর্য থেকে আলো এসে পৃথিবীতে পড়েছে, তারপর পিছনদিকে চলে গিয়েছে পৃথিবীর ছায়া। সেই ছায়ার ভিতর ডুবে আছে চাঁদ। তাহলে এক্ষেত্রে পূর্ণিমা হলেও চাঁদ অন্ধকারে ঢাকা। এটাই হল **পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ**। এইজন্য শুধু পূর্ণিমাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবীতে **খ, গ** অথবা **ঘ** — যেখানেই তুমি থাকো না কেন, এই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাবে। কিন্তু **ক** স্থানে থাকলে দেখতে পাবে না, কারণ সেদিকে দিনের আলো অর্থাৎ সূর্য রয়েছে, চাঁদ নেই। কিন্তু ঐ ছবিতে চাঁদ যদি ডান অথবা বামদিকে সামান্য একটু সরে থাকে তাহলেই **গ** বা **ঘ** বিন্দু ছুঁয়ে আগত আলো তাকে দুটি অংশে ভেঙে দিত। সেক্ষেত্রে অর্ধেকটা চাঁদ থাকত আলোতে, বাকিটা ছায়ার ভিতরে। সেটা হতো **খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ**। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ একটু লালচে দেখায়। একে ব্লাড মুন বলে।

এবার নীচের তিনটে ছবি দেখো (১, ২, ৩)। এই তিনটে ছবিতে অমাবস্যার পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। চাঁদের ছায়া এসে পড়েছে পৃথিবীর গায়ে। কিন্তু ১নং ছবিটাতে চাঁদটা সামান্য পাশে আঁকা হয়ে গেছে। একটু সরিয়ে আঁকলে ছায়াটা

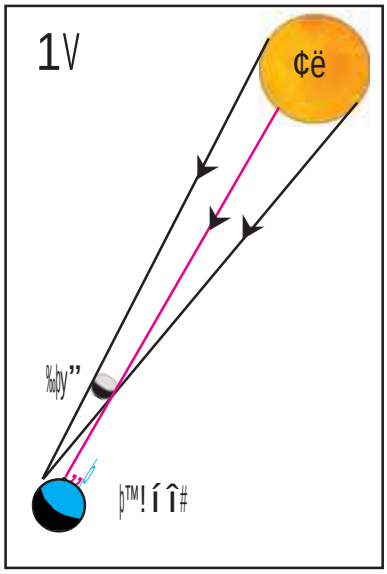

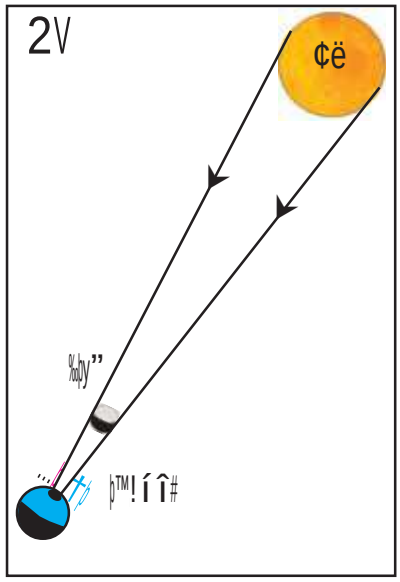

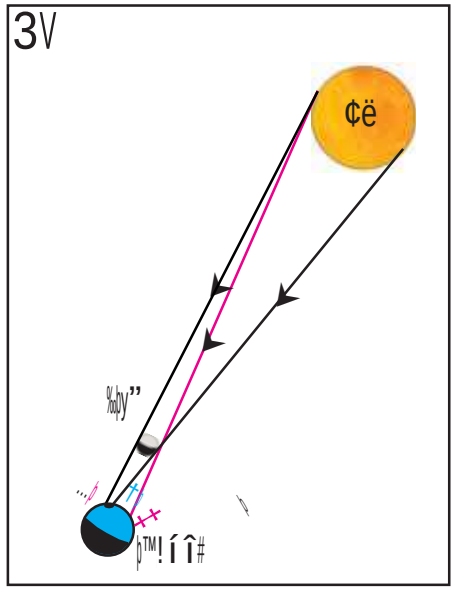

পৃথিবীর ওপর পড়ত। **ক** বিন্দুতে যে সূর্যের আলোটা এসে পড়েছে, তার বাঁদিকে থাকা সূর্যের অংশ থেকে কোনো আলো কিন্তু **ক** বিন্দুতে আসছে না, যা আসছে, তার সবটাই ডানদিকে থাকা সূর্যের অংশটা থেকে তাই **ক** বিন্দু থেকে সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যাবে সূর্যের বামদিকটা ঢাকা পড়েছে কেবল। এই ঘটনাটাকে তাই বলা হয় খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ। এবার ২নং ছবিটা দেখো। **খগ** অংশের পৃথিবীতে চাঁদের ছায়া গাঢ়ভাবে পড়েছে। ঐ অংশে থাকা মানুষের চোখে সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাবে। এ হল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ-এর অবস্থা। শেষে ৩ নং ছবি। এখানে চাঁদের গাঢ় ছায়াতে ঢাকা **খগ** অংশ অর্থাৎ পূর্ণগ্রাস এলাকাটা একটু পাশে রয়েছে। আমরা দেখছি **ঘ** বিন্দুর পরিস্থিতি। ওখানে সূর্যের একদম বামদিক থেকে আলো এসে পড়েছে। ফলে পুরো সূর্যই ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ **ঘ** স্থান থেকে সূর্যগ্রহণ দেখতেই পাওয়া যাবে না।

✸ **সূর্যগ্রহণ কোথায় কেমন? নিজে আঁকো। বুঝে নাও :**

কোথায় পূর্ণগ্রহণ, কোথায় খণ্ডগ্রহণ, কোথায় গ্রহণ নয়? স্কেল ধরে লাইন টেনে দেখাও। লেখো:

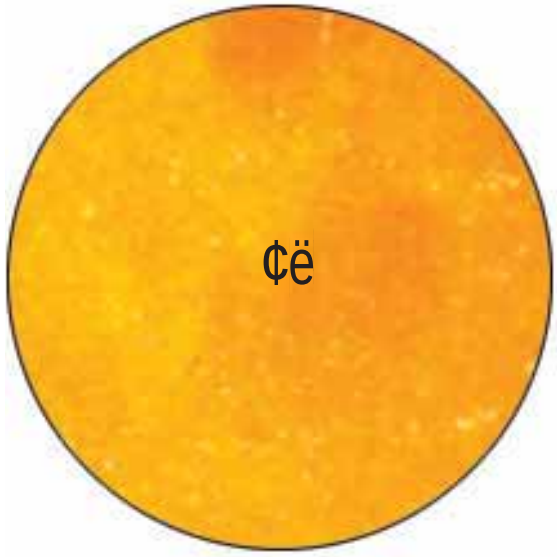

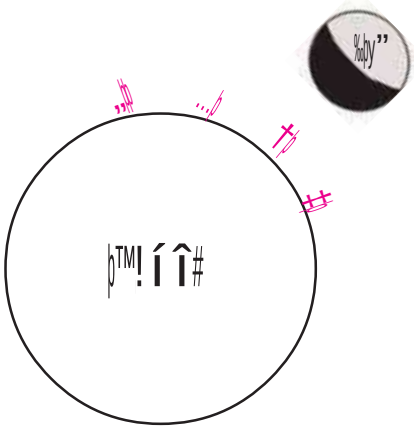

ক বিন্দুতে	
খ বিন্দুতে	
গ বিন্দুতে	
ঘ বিন্দুতে	

জোয়ার ভাটা

সূর্য আর চাঁদের মিলিত মহাকর্ষ বলের টানে পৃথিবীতে সমুদ্রের উপকূল ও নদী মোহনায় প্রায় সাড়ে বারো ঘণ্টা অন্তর জল বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাকে বলে জোয়ার। ঠিক মাঝের সময়ে, অর্থাৎ জোয়ারের ছয় ঘণ্টা তেরো মিনিট বাদে জল একেবারে কমে যায়। একে বলে ভাটা। বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষ বলের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, এই আকর্ষণ দুটি বস্তুর কেন্দ্র বরাবর সরলরেখা ধরে সক্রিয় হয়। নীচের ছবিটি লক্ষ করো। চাঁদের দিকে থাকা পৃথিবী এবং চাঁদের বিপরীত দিকে থাকা পৃথিবী — দুদিকেই এই কারণে জোয়ার হয়েছে। তবে চাঁদের দিকে থাকা অংশটি কাছে বলে সেখানে জোয়ার হয়েছে অনেক বেশি। একে সেইজন্য **মুখ্য জোয়ার** বলে। চাঁদের বিপরীত দিকে থাকা অংশে জোয়ার হয়েছে কম, কারণ সেটি চাঁদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত। এই জোয়ারটিকে তাই বলা হয় **গৌণ জোয়ার**। যেকোনো অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বেশি জোয়ার হয়। গ্রহণের দিন তার প্রাবল্য আরো বাড়ে।

চাঁদের জন্য পৃথিবীর দুই দিকের (ক এবং খ স্থানে) জোয়ারের মধ্যে পার্থক্য বেশি

✸ **ভেবে নিয়ে উত্তর দাও :**

জোয়ারের জল বেশি উঠবে : অমাবস্যার দিন / পঞ্চমীর দিন / নবমীর দিন।

মনে রাখা জরুরি :

- **মহাকাশ (মহা আকাশ)** - বিশাল আকারে সর্বদিকে যা প্রকাশিত।
- **ছায়াপথ** - গড়ে দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি, যারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি দল বেঁধে আছে।
- **নীহারিকা** - শীতল গ্যাস ও ধুলোর মেঘ যা থেকে হাজার হাজার নক্ষত্র জন্ম নেয়।
- **আকাশগঙ্গা ছায়াপথ** - যে ছায়াপথে সূর্য রয়েছে।
- **ধূমকেতু** - লম্বা চুলের গুচ্ছ বা লেজযুক্ত (যা আসলে ধুলোর পুঞ্জ) মহাজাগতিক বস্তু।
- **সূর্যগ্রহণ** - পৃথিবীতে চাঁদের ছায়ার পতন।
- **মুখ্য জোয়ার** - চাঁদের দিকে থাকা পৃথিবীতে যে প্রবল জোয়ার হয়।
- **গৌণ জোয়ার** - চাঁদের বিপরীত দিকে থাকা পৃথিবীতে যে তুলনামূলক দুর্বল জোয়ার হয়।
- **ব্লাডমুন** - পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় ছায়াচ্ছন্ন লালচে রঙের পূর্ণচন্দ্র।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :**

১.১ মহাজাগতিক যে বস্তুর পেছনে ধোঁয়ার মতো একটি পতাকা দেখা যায় তা হলো —

ক) নীহারিকা খ) ধূমকেতু গ) উল্কা ঘ) গ্রহ।

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :**

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ সূর্যের সবথেকে কাছে যে নক্ষত্র, তার নাম ————।

২.১.২ চাঁদের ছায়ায় সূর্য আংশিক ঢেকে গেলে তাকে বলে ———— সূর্যগ্রহণ।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১. নীহারিকার ভেতর অনেক নক্ষত্রের জন্ম হয়।

২.২.২. প্রায় ১২ ঘণ্টা অন্তর কোনো স্থানে জোয়ার আরও ঘটে।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ আকাশগঙ্গা	১ গ্রহ
২.৩.২ প্রক্সিমা সেনটাউরি	২ চন্দ্রগ্রহণ
২.৩.৩ ইউরেনাস	৩ নক্ষত্র
২.৩.৪ ব্লাড মুন	৪ ছায়াপথ

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ ধূমকেতু শব্দের অর্থ কী?

২.৪.২ নদী মোহনা ও সমুদ্রে জল কমে যায় কত সময় অন্তর?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ ছায়াপথ কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

৩.২ ব্লাড মুন কাকে বলা হয়?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৪.১ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

৪.২ ছায়াপথ ও নীহারিকার মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

2 পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা কোথায়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- অবস্থান বলতে কী বোঝায় তা উল্লেখ করতে পারবে।
- গ্লোবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবে।
- গ্লোবের উপর এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা চিহ্নিত করতে পারবে।
- নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখার ভিত্তিতে গোলার্ধ নির্ণয় করতে পারবে।
- কীভাবে পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আমরা সবাই পৃথিবীতে থাকি, আরও সঠিকভাবে বলা যায় আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে বা পৃথিবীর উপরে অবস্থান করি। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর অসংখ্য শহর বা গ্রাম আছে, তার মধ্যে কোনো একটি শহর বা গ্রামে তুমি থাকো। এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি যে শহর বা গ্রামে থাকো সেটি ভূপৃষ্ঠের ঠিক কোথায় অবস্থিত? এই প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে তোমাদের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। আমরা এই অধ্যায়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করবো।

ভূগোলে 'অবস্থান' বলতে কোনো একটি স্থান ভূপৃষ্ঠের ঠিক কোন জায়গায় আছে তা বোঝায়। পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যেহেতু বিশাল এবং তার সাপেক্ষে আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই আমাদের পক্ষে পুরো পৃথিবীকে একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়। এজন্যই ভৌগোলিকরা পৃথিবী সম্বন্ধে জানার জন্য বা কোনো স্থানের অবস্থান সম্বন্ধে জানার জন্য 'গ্লোব'-এর সাহায্য নেন।

গ্লোব

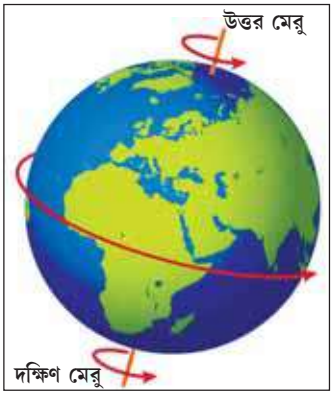

পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বা মডেল হল গ্লোব বা ভূ-গোলক। পাশের চিত্রে একটি গ্লোব দেখানো হল। গ্লোবটি ভালো করে লক্ষ করে দেখো, এই গ্লোবটির উত্তরতম বিন্দুটি হল **পৃথিবীর উত্তর মেরু** এবং দক্ষিণতম বিন্দুটি হল **পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু**। গ্লোবটি আরও ভালোভাবে দেখলে দেখতে পাবে যে গ্লোবটির উপরে কতকগুলি রেখা টানা আছে।

এই রেখাগুলির মধ্যে গ্লোবের উপর আড়াআড়িভাবে যে বৃত্তাকৃতি রেখাগুলি টানা আছে সেগুলি হল **অক্ষরেখা**, এবং এই অক্ষরেখাগুলির মধ্যে পৃথিবীর ঠিক মাঝ বরাবর যে কাল্পনিক বৃত্তাকৃতি রেখা টানা হয়েছে সেটি হল, নিরক্ষরেখা। নিরক্ষরেখা গ্লোবের উপর টানা অক্ষরেখাগুলির মধ্যে সবথেকে বড়ো। এই রেখাটি পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তরদিকের অংশটি হল উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ দিকের অংশটি হল দক্ষিণ গোলার্ধ।

গ্লোবের উপর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু সংযোগকারী যে অর্ধবৃত্তাকৃতি রেখাগুলি টানা হয়েছে সেগুলি হল **দ্রাঘিমারেখা**। দ্রাঘিমারেখাগুলির মধ্যে পৃথিবীর ঠিক

মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে যে অর্ধবৃত্তাকৃতি রেখাটি টানা হয়েছে সেটি হল মূলমধ্যরেখা। মূলমধ্যরেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি সমান ভাগে ভাগ করেছে। মূলমধ্যরেখার পূর্ব দিকের অংশটি হল পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম দিকের অংশটি হল পশ্চিম গোলার্ধ।

নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে ১° ডিগ্রি অন্তর ৮৯টি করে মোট ১৭৮টি অক্ষরেখা আঁকা যায়। নিরক্ষরেখাও একটি অক্ষরেখা, তাই গ্লোবের উপর মোট ১৭৯টি অক্ষরেখা আঁকা যেতে পারে। আবার মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিম ১° ডিগ্রি অন্তর ১৭৯টি করে মোট ৩৫৮ টি দ্রাঘিমা রেখা আঁকা যায়। এর সাথে মূলমধ্যরেখা বা ০° দ্রাঘিমারেখা এবং ১৮০° দ্রাঘিমারেখাসহ গ্লোবের উপর মোট ৩৬০টি দ্রাঘিমারেখা আঁকা যেতে পারে।

১° ডিগ্রি অন্তর আঁকা প্রত্যেকটি অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার নির্দিষ্ট মান আছে।

আগের পৃষ্ঠার গোলকটি ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে যে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি একে অপরকে ছেদ করে একটি জালের মতো বিন্যাস তৈরি করেছে। ভৌগোলিকরা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার এই ছেদবিন্দু ও জালিকাকৃতি বিন্যাসের সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন।

নীচের ছবির মাধ্যমে কীভাবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয় বা স্থানটি পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত তা বোঝার চেষ্টা করো। এই ছবিতে আড়াআড়ি টানা রেখাগুলি হলো অক্ষরেখা এবং লম্বালম্বি টানা রেখাগুলি দ্রাঘিমারেখা। গ্লোবের উপর যখন আঁকা হয় তখন অক্ষরেখাগুলি বৃত্তাকৃতি ও দ্রাঘিমারেখাগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতি, কিন্তু এই রেখাগুলিকে যদি আমরা কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর আঁকি বা তোমরা তোমাদের খাতায় আঁকো তাহলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলিকে সরলরেখার সাহায্যে দেখানো যায়। ছবিতে ‘A’ চিহ্নিত স্থানটি নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে অবস্থিত ও মূলমধ্যরেখার পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ১০° উত্তর অক্ষরেখা ও ১০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার ছেদবিন্দুতে অবস্থিত । অর্থাৎ ‘A’ স্থানটির অবস্থান হলো ১০° উত্তর ও ১০° পূর্ব, আবার চিত্রে ▨ চিহ্নিত স্থানটির অবস্থান হল — ২০° উত্তর থেকে ৩০° উত্তর এবং ২০° পশ্চিম থেকে ৩০° পশ্চিম।

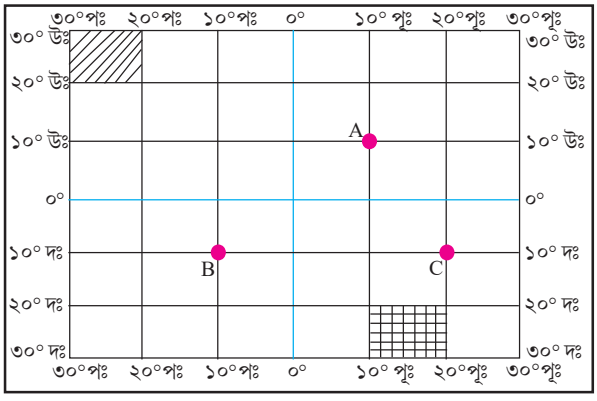

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়

✸ **তোমরা প্রদত্ত চিত্র থেকে B ও C চিহ্নিত স্থানদুটির এবং ▦ চিহ্নিত অঞ্চলটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করো।**

✷ **রেখাচিত্রটি দেখে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (সূত্র : মূলমধ্যরেখা ও নিরক্ষরেখা থেকে ২০^0 ব্যবধানে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি অঙ্কন করা হয়েছে।)**

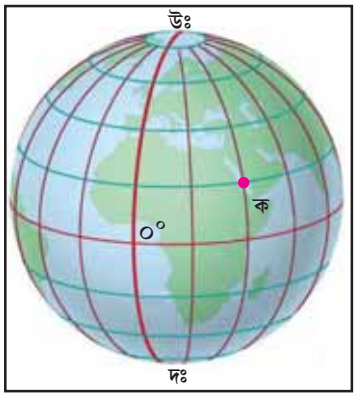

- নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখাকে চিহ্নিত করো।
- ৪০° পূর্ব ও ২০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা চিহ্নিত করো।
- ৬০° উত্তর ও ৪০° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে চিহ্নিত করো।
- 'ক' স্থানটির দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ কত?

মনে রাখা জরুরি :

- **অবস্থান** — কোনো একটি স্থান ভূপৃষ্ঠের উপর ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেটাই তার অবস্থান।
- **গ্লোব** — পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।
- **নিরক্ষরেখা** — পৃথিবীর ঠিক মাঝবরাবর আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত কাল্পনিক বৃত্তাকৃতি রেখা।
- **উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বিন্দু** — পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু বা স্থানটি হলো উত্তর মেরু বিন্দু এবং দক্ষিণতম বিন্দু বা স্থানটি হলো দক্ষিণ মেরু বিন্দু।
- **মূলমধ্যরেখা** — উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু সংযোগকারী পৃথিবীর মাঝবরাবর বিস্তৃত অর্ধবৃত্তাকৃতি রেখা।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'তুমি কোথায় আছো' অধ্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ কোনো একটি স্থান যদি ২০° উত্তর অক্ষরেখার উপর অবস্থিত হয় তাহলে নিরক্ষরেখার সাপেক্ষে সেটি যে গোলার্ধে অবস্থিত তা হলো—

(ক) উত্তর (খ) দক্ষিণ (গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম।

১.২ নিরক্ষরেখার মান —

(ক) ০° (খ) ৩০° (গ) ৯০° (ঘ) ৬০°।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হলো _____।

২.১.২ পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দুটি _____ নামে পরিচিত।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ ১° অন্তর ভূ-গোলকে অঙ্কিত অক্ষরেখার সংখ্যা ১৭৯টি।

২.২.২ মূলমধ্যরেখার মান ১০° উত্তর।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ মূলমধ্যরেখা	১. ৯০°
২.৩.২ উত্তর মেরু	২. ৩৬০টি
২.৩.৩ দ্রাঘিমারেখা	৩. ০°

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুটি কী নামে পরিচিত?

২.৪.২ গ্লোবের উপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি কত ডিগ্রি ব্যবধানে আঁকা হয়েছে?

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ অবস্থান বলতে কী বোঝো ?

৩.২ নিরক্ষরেখার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ একটি চিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করবে বুঝিয়ে দাও।

3 পৃথিবীর আকৃতি ও আবর্তন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পৃথিবীর গোলকাকৃতির ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পৃথিবীর আবর্তন গতি ও তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

পৃথিবী কী সমতল এবং স্থির?

ফাঁকা একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, চারিদিকে যেন মাঠটা সমতলভাবে ছড়িয়ে শেষপ্রান্তে গিয়ে আকাশ স্পর্শ করেছে। অথবা আকাশ যেন নিজেই নেমে এসে ছুঁয়েছে মাঠের শেষ সীমা। ওই সীমানাকে বলে **দিগন্ত**।

দিগন্ত দিয়ে ঘেরা এই সমতল মাঠের মতো অভিজ্ঞতা সমুদ্রে ভেসে থাকা কোনো জাহাজের যাত্রীদেরও হতে পারে। তারাও দেখবে, চারিদিকে দিগন্ত-ঘেরা এক সমতল সমুদ্র যতদূর চোখ যায়—ছড়িয়ে রয়েছে।

এইজন্যই সভ্যতার শুরু থেকে অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ ভাবত, তারা যে পৃথিবী গ্রহটাতে থাকে, সেটা সমতল বা চ্যাপ্টা আকৃতির এবং সে তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে শেষ হয়, যাকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর কিনারা। থালার মতো সেই পৃথিবীর কিনারাতে পৌঁছে আরো এগোতে গেলে নিশ্চয়ই নীচে কোথাও পড়ে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত! বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরাও এই রকমই ভাবতেন।

শুধু তাই নয়, তাঁরা এও ভাবতেন যে সমগ্র মহাকাশের একেবারে কেন্দ্রে স্থিরভাবে রয়েছে এই থালার মতো পৃথিবী। তাকে ঘিরে কাছে দূরে পরিক্রমা করে চলেছে সূর্য, চাঁদ, অন্যান্য গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ আর আকাশের যত তারা।

আমরা এখন জানি, পৃথিবী সমতল নয়, গোলক-আকৃতি এবং সে স্থিরও নয়। নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ক্রমাগত লাট্টুর মতো আবর্তন করে চলেছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। আসলে আমরা পৃথিবীর আকারের তুলনায় এতই ছোট যে, পৃথিবীর বিরাট গোলকটাকে মনে হয় সমতল, আর লাট্টুর মতো তার আবর্তনটাও বুঝতে পারি না। মনে হয়, গ্রহ তারাগুলোই বুঝি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমা করে আসছে। ট্রেনে বসে যেমন মনে হয়, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না, বাইরের বাড়িঘর গাছপালাগুলোই চলে যাচ্ছে পিছনদিকে—ঠিক সেই রকম।

ভুল ধারণা থেকে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছে মানুষের। অনেক নিন্দা, তামাশা এবং অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের, অনেককে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গবেষণা থেমে থাকেনি। তোমরা আরেকটু বড়ো হয়ে কেপলার, কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীর সেইসব কথা জানবে।

ভেবে নাও এবং লিখে ফেলো :

- সন্ধেবেলা পূর্ব আকাশে যে নক্ষত্রটিকে দেখতে পাবে, শেষরাতে তাকে আকাশের কোন দিকে দেখবে বলো তো?
- তুমি যদি ট্রেনে করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকো, তাহলে বাড়িঘর ও গাছপালাগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে সরে যেতে দেখবে?
- পৃথিবী যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে লাট্টুর মতো আবর্তন করত, তাহলে বলো তো সূর্য কোনদিকে অস্ত যেত?

পৃথিবীর আকৃতি গোলকের মতো

পৃথিবী যে সমতল নয়, তার আকৃতি গোলকের মতো — সেটা পরোক্ষ অনেকগুলো ভাবনা দিয়ে ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছিল। যেমন —

- সমতল মাঠে না দাঁড়িয়ে কোনো উঁচু টিলা বা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে দিগন্তরেখা একটু নীচু লাগে এবং মনে হয়, সত্যিই যেন কোনো গোলকের গায়ে দাঁড়িয়ে আছি।
- চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়া সবসময়েই বৃত্তচাপের মতো পড়ে। অনেক রকম বস্তুর ছায়া নিয়ে পরীক্ষা করে অ্যারিস্টটল প্রথম বুঝতে পারেন, একমাত্র গোলক আকৃতির বস্তু হলেই তার ছায়া সবসময় বৃত্তচাপের মতোই হতে পারে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন, পৃথিবী সমতল নয়, গোলক আকৃতির।
- বন্দরে যখন কোনো জাহাজ আসে, তখন প্রথমে তার মাস্তুল ও চিমনি দিগন্তে জেগে ওঠে। তারপর তার মধ্যভাগ ও শেষে পুরো জাহাজটিকে দেখা যায়। যেন জাহাজটা দিগন্তের তলা থেকে উঠে এল। সমুদ্রের জলতল বৃত্তচাপের মতো বা গোলকের গায়ের মতো বাঁকা না হলে এই ঘটনা ঘটতে পারে না।
- সূর্য, চাঁদসহ মহাকাশের সমস্ত উজ্জ্বল বস্তুগুলিকেই দূরবীনে গোলক আকৃতির দেখায়। তাই অনুমান করা যায়, পৃথিবীও একটি গোলক।
- পূর্বদিকে থাকা স্থানগুলিতে সবসময় আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, পশ্চিমে থাকা স্থানগুলিতে হয় দেরিতে। পৃথিবী গোলক বলেই এমন ঘটে। যদি সমতল হত, তাহলে সব স্থানে একসঙ্গেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হত।
- দীর্ঘ কোনো খালের জলে মাত্র ১ কিমি অন্তর একই দৈর্ঘ্যের তিনটি লাঠি ভাসিয়ে দিলে দেখা যায়, মাঝের লাঠিটি বেশি উঁচু হয়ে আছে। খালের জলতল সমতল না হয়ে গোলকের মতো বাঁকা হলে তবেই এই ঘটনা সম্ভব।
- বিজ্ঞানী এরাটোসথেনিস আলেকজান্দ্রিয়া আর সাইনি (এখনকার মিশরের অন্তর্গত আসোয়ান শহর) নামক দুটো স্থানে কুয়োর ভেতরে যেভাবে সূর্যের আলো পড়েছিল, তা মেপে এবং সহজ কিছু অঙ্ক কষে গোলক আকৃতির পৃথিবীর পরিধির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে ফেলেছিলেন। সেই যুগে এ ছিল এক বিরাট কৃতিত্ব।

শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজ নাবিক ম্যাগেলান ও তাঁর সঙ্গীরা স্পেন থেকে ১৫১৯ থেকে ১৫২২ সাল—এই তিন বছর ধরে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে শেষে যখন আবার ম্যাগেলানের সঙ্গীরা স্পেনে ফিরে এলেন, তখন প্রায় নিঃসন্দেহে বোঝা গেল পৃথিবী গোলক আকৃতিবিশিষ্ট।

ম্যাগেলান ও তাঁর সঙ্গীদের যাত্রাপথ

এখন অবশ্য আমরা মহাকাশ থেকে তোলা ছবিতেই বুঝতে পারি পৃথিবীর গোলক আকৃতি।

গোলাকৃতি নয়, গোলকাকৃতি (গোলক + আকৃতি = গোলকাকৃতি)

অনেক সময় আমরা পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকৃতি না লিখে গোলাকৃতি লিখে ফেলি। কিন্তু প্রথম কথাটা লেখাই ঠিক। কারণ, গোল আকৃতি হল বৃত্তের চেহারা, যেমন - সাইকেলের চাকা এবং গোলক আকৃতি হলো ফুটবল বা লেবুর আকৃতি। সেইজন্য পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকৃতি লেখাই উচিত।

ভেবে নাও এবং লিখে ফেলো :

- অ্যারিস্টটল বুঝেছিলেন, একমাত্র গোলকের ছায়াই সবসময় বৃত্তচাপের মতো হবে। বিশেষভাবে ধরলে থালার ছায়াও বৃত্তচাপের মতো হতে পারে। কিন্তু কীভাবে ধরলে থালার ছায়া বৃত্তচাপের মতো হবে না বলোতো?
- পৃথিবী সমতল হলে বন্দরে কোনো জাহাজকে কীভাবে প্রবেশ করতে দেখতে?

পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো

খুঁটিয়ে হিসেব করে বোঝা গেছে, পৃথিবী ঠিক ফুটবলের মতো নিখুঁত গোলক নয়, বরং কমলালেবুর মতো কিছুটা উত্তর-দক্ষিণ চাপা। এমন গোলকের নাম জ্যামিতি অনুসারে হলো অভিগত গোলক। তখন থেকে আমরা পৃথিবীকে বলি **অভিগত গোলকের মতো**।

আরও গবেষণার পরে বোঝা গেল, পৃথিবীর আকৃতি ঠিক অভিগত গোলকের মতোও নয়। তার উত্তর মেরু সামান্য উঁচু, দক্ষিণ মেরু সামান্য নীচু। আবার, উত্তরের মাঝামাঝি জায়গাটা সামান্য নীচু, দক্ষিণের মাঝামাঝি জায়গাটা আবার সামান্য উঁচু। তার ওপর পর্বতমালাগুলো উঠে আছে, সমুদ্রের মেঝেগুলো নেমে আছে। সব মিলিয়ে কিছুটা নাসপাতির মতো হলেও শেষ বিচারে, পৃথিবীর সাথে তুলনা করা যায়—এমন কোনো নিখুঁত উদাহরণ কোনোখানে নেই। ফলে, আজকাল বলা হয়, পৃথিবীর আকৃতি ঠিক পৃথিবীরই মতো অতুলনীয়!

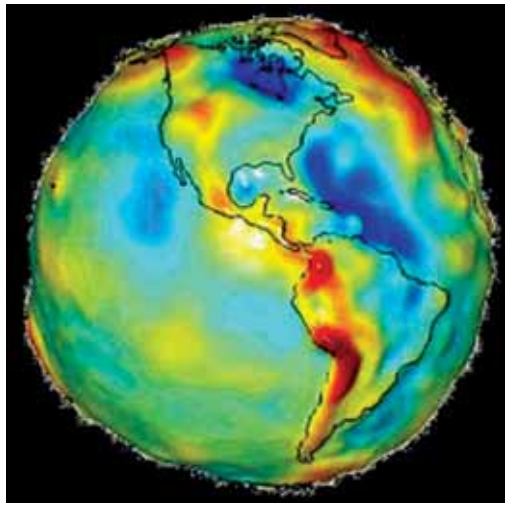

পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীরই মতো

➢ **ভেবে নাও এবং লিখে ফেলো :**

- অভিগত গোলক ওপরে-নীচে একটু চাপা। তাহলে, অভিগত গোলকের ব্যাস কোনদিক বরাবর সামান্য বেশি হবে ? উত্তর-দক্ষিণ বরাবর/পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। (ভুল উত্তরটা কেটে দাও)

পৃথিবীর আবর্তন

তোমরা জানো, পৃথিবী নিজেই লাট্টুর মতো নিজের অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে চলেছে বলেই সূর্য পূর্বদিকে উঠছে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যাচ্ছে। পৃথিবীর একদিকে হচ্ছে দিন আর অন্যদিকে রাত্রি। দিন ও রাত্রির কাল্পনিক মিলনরেখা বরাবর দেখা যায় আবছা আলোয়মাখা ছায়াবৃত্ত। এর অর্ধেকটা ভোরের আলো, আর বাকি অর্ধেকটা গোধূলির। সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে ঘরে ফিরতে-থাকা গরুদের পায়ের খুরে ধুলো উড়ে দিনের শেষ আলোটুকু মলিন হয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। সেজন্যই ঐ সময়কে বলে গোধূলি।

একটা দিন আর একটা রাত মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা, অর্থাৎ পৃথিবীর পুরো একবার আবর্তন। কিন্তু ঘণ্টাগুলোকে আলাদা করে চিনব কীভাবে? এখন না হয় আমরা ঘড়ি দেখে নিচ্ছি। কিন্তু আগেকার দিনে যখন কোনো ঘড়ি ছিল না, তখন মানুষ কীভাবে সময় মাপত?

সূর্য আর চাঁদের আলোয় লম্বাটে বস্তু, যেমন - মিনার, স্তম্ভ প্রভৃতি থাকলে তার ছায়া মাটিতে পড়ে। দিন বা রাতের নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট। যেমন, সকাল বা বিকেলবেলা সূর্য দিগন্তের কাছে থাকে বলে সবকিছুরই ছায়া খুব লম্বাটে হয়। কিন্তু দুপুরবেলা সূর্য যখন মাথার ওপর, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য খুব ছোটো হয়। ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপেও তাই অনেকটা আন্দাজ করা যায় ক'টা বেজেছে।

এইভাবেই আমরা পেয়েছি সূর্যঘড়ি আর চন্দ্রঘড়ির নানা বৈচিত্র্য। এছাড়াও আগেকার দিনে সময় মাপার জন্য জলঘড়ি, বালিঘড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো পাত্র জল বা বালিতে ভর্তি হয়ে যেত বলে তা থেকেও সময় বোঝা যেত। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করা ছিল অসুবিধাজনক।

মনে রাখা জরুরি :

- **দিগন্তরেখা** — আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ যেখানে মিলছে বলে মনে হয়।
- **অভিগত গোলক** — উত্তর-দক্ষিণ চাপা একটি গোলক।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'পৃথিবী কি গোল' এবং 'পৃথিবীর আবর্তন' অধ্যায় দুটিতে আরো বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ সবসময় বৃত্তচাপের মতো ছায়া হয় যে আকৃতিযুক্ত বস্তুর, তা হলো—

(ক) বলয়াকৃতি (খ) অর্ধগোলাকৃতি (গ) গোলকাকৃতি (ঘ) অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

১.২ পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করলে সূর্যকে আমরা যেদিকে উঠতে দেখতাম তা হলো —

(ক) পূর্বদিক (খ) পশ্চিমদিক (গ) উত্তরদিক (ঘ) দক্ষিণদিক।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীর পরিধি প্রথম নির্ণয় করেছিলেন বিজ্ঞানী _____।

২.১.২ সূর্যের আলোয় লম্বা বস্তুর ছায়া মেপে সময় নির্ণয়ের যে ঘড়ি তৈরি করা হয়, তাকে বলে _____ ঘড়ি।

২.২ নীচের বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ অ্যারিস্টটল বলেছিলেন পৃথিবী সমতল।

২.২.২ নিজের অক্ষের চারিদিকে পৃথিবী আবর্তন করছে পশ্চিম থেকে পূর্বে।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ পৃথিবীর আকৃতি কেন অভিগত গোলকের মতো বলা হয়?

২.৩.২ চন্দ্রগ্রহণে চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়া কীরূপ দেখতে?

৩. নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ দিগন্তরেখা কাকে বলে?

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৪.১ পৃথিবীর গোলকাকৃতির স্বপক্ষে তিনটি পরোক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যা করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. **বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :**

১.১ আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আকৃতি —

(ক) চরকির মতো (খ) গোলকের মতো (গ) ডাম্বেলের মতো (ঘ) দণ্ডের মতো।

১.২ প্রক্সিমা সেনটাউরি নক্ষত্রে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগবে প্রায় যত আলোকবর্ষ —

(ক) চার (খ) চোদ্দ (গ) চব্বিশ (ঘ) চৌত্রিশ।

১.৩ যে দিকের স্থানগুলিতে আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় —

(ক) পূর্ব (খ) পশ্চিম (গ) উত্তর (ঘ) দক্ষিণ।

১.৪ চন্দ্রগ্রহণে চাঁদের গায়ে পৃথিবীর ছায়ার আকৃতি —

(ক) সরলরৈখিক (খ) বৃত্তচাপীয় (গ) উপবৃত্তাকৃতি (ঘ) অনিয়তাকৃতি।

১.৫ কোনো একটি স্থান যদি ৩৫° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত হয় তাহলে মূলমধ্যরেখার সাপেক্ষে সেই স্থান যে গোলার্ধে অবস্থিত তা হলো—

(ক) উত্তর (খ) দক্ষিণ (গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম।

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :**

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ সূর্যের সব থেকে কাছের নক্ষত্রটির নাম _____।

২.১.২ সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী থাকলে যে গ্রহণ হতে পারে, তা হল _____।

২.১.৩ পৃথিবীর পরিধি প্রথম মেপেছিলেন যে বিজ্ঞানী তাঁর নাম _____।

২.১.৪ রাতের আকাশে নক্ষত্রেরা অস্ত যায় _____ দিকে।

২.১.৫ অক্ষরেখাগুলির মধ্যে বৃহত্তম হলো _____।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ নীহারিকা শব্দের মানে হলো 'অতিক্ষুদ্র তুষারকণিকা সমূহের পুঞ্জ'।

২.২.২ অমাবস্যার দিন প্রবল জোয়ার হয়।

২.২.৩ পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করে।

২.২.৪ মেঘলা দিনেও সূর্যঘড়িতে সময় মাপা যায়।

২.২.৫ মূলমধ্যরেখা বৃত্তাকৃতি।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ ধূমকেতু	১. সূর্য ও চাঁদের মহাকর্ষ বল
২.৩.২ জোয়ার	২. প্রক্সিমা সেনটাউরি
২.৩.৩ নক্ষত্র	৩. পৃথিবীর গোলক আকৃতির প্রমাণ
২.৩.৪ নাবিক ম্যাগেলান	৪. ধোঁয়ার মতো পতাকাযুক্ত তারা

২.৪. একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ সূর্য ও তার পরিবার কোন ছায়াপথে রয়েছে?

২.৪.২ চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে যে গ্রহণ সৃষ্টি করে তার নাম কী?

২.৪.৩ আকাশ ও ভূমির মিলনরেখাকে কী বলে?

২.৪.৪ কোন দ্রাঘিমারেখাটি পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে বিভক্ত করে?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ চাঁদকে কখন ব্লাড মুন বলা হয়?

৩.২ নীহারিকা কাকে বলে?

৩.৩ পৃথিবীর আবর্তন এবং গোলক আকৃতি আমরা বুঝতে পারি না কেন?

৩.৪ গোধূলি কাকে বলে?

৩.৫ ভূ-গোলক কাকে বলে?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ ছায়াপথ ও নীহারিকার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৪.২ মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ারের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৪.৩ কোনো জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার সময় তার মাস্তুল আগে দেখা যায় কেন?

৪.৪ 'পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো' — উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো।

৪.৫ একটি চিত্রের সাহায্যে ভূ-গোলকে নিরক্ষরেখা, মূলমধ্যরেখা ও উত্তর মেরুবিন্দু চিহ্নিত করো।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ সূর্যগ্রহণের একটি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও খণ্ডগ্রাস ও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কীভাবে হয়?

৫.২ পৃথিবীর গোলক আকৃতির তিনটি পরোক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যা করো।

৫.৩ সূর্যঘড়ির সাহায্যে কীভাবে সময় মাপা যায় তা ব্যাখ্যা করো।

4 বাতাস-মাটি-জল

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- আমাদের ঘিরে আছে যে বায়ুমণ্ডল, তার বিভিন্ন স্তর ও তাদের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবে।
- মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও আকৃতি কীভাবে বদলে যাচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পৃথিবীর সমস্ত জল কীভাবে চক্রাকারে ঘুরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাজকর্ম করে চলেছে— তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বায়ু, জল এবং মাটি কীভাবে প্রাণের সাথে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে আছে— সেই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

বাতাস ভেদ করে মহাকাশে

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বাতাসের পুরু একটা চাদর। এই বাতাস চোখে দেখতে পাই না আমরা, কিন্তু শরীরে অনুভব করতে পারি। সবসময়েই তো প্রশ্বাস নিচ্ছি আর নিঃশ্বাস ফেলছি— টের পেতে অসুবিধে হয় না যে বুকের গভীরে বাতাস ঢুকে যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে।

উঁচুতে যখন ঘুড়ি ওড়াই, তখন বাতাসের টানে তার ভেসে যাওয়া বুঝতে পারি। বাতাসে ফানুস ভেসে চলে অনেক উঁচু দিয়ে — দেখতে দেখতে মনে হয়, আরো কতটা উঁচু পর্যন্ত রয়েছে এই বাতাস!

রকেটে করে নীল আকাশ ফুঁড়ে পাড়ি দেওয়া শুরু করলে কিছুক্ষণ পরেই এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা যায়। বাতাসের নীল চাদরটা পড়ে আছে নীচে আর ওপরের দিকে গভীর কালো আকাশে নক্ষত্র সব জ্বলজ্বল করছে, পাশেই জেগে আছে উজ্জ্বল সূর্য, কিন্তু তার তীব্র আলো সীমিত হয়ে আছে তার চাকতির ভিতরেই — চারিদিকে ছড়িয়ে চাঁদ-তারাদের ঢেকে দেয়নি। এমন কেন হল! আসলে সূর্যের আলোর সাতটি রঙের মধ্যে নীল রঙটা বাতাসের ভিতর চারপাশে ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তাই আকাশটাকে নীল মনে হয়। বাতাস যেখানে নেই, আকাশ সেখানে সবসময়েই কালো।

স্থির বাতাস, চলমান বাতাস

পৃথিবীর বাতাস সবসময়েই স্থান বদল করছে। কখনো পাশাপাশি, কখনো উপর-নীচে, কখনো হয়ত সামান্য সময়ের জন্য সে স্থিরও থাকতে পারে।

বন্ধ ঘরে পাখা না চালিয়ে একটা ধূপ জ্বেলে দাও। দেখবে, ধূপের ধোঁয়াটা অনেকটা উঁচু পর্যন্ত প্রায় সরলরেখায় উঠে যাচ্ছে। এটি হলো স্থির বাতাসের লক্ষণ। পাখা চালালেই ধোঁয়া এলোমেলো হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠবে।

ভারী বাতাস, হাল্কা বাতাস

সমতলের মানুষ দার্জিলিং বা গ্যাংটক গেলে অনেকের কানে অস্বস্তি হয়। পর্বত অভিযানে গেলে অনেকেরই দরকার পড়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার।

আসলে সমুদ্রের কাছাকাছি উচ্চতায় বা সমতলে বাতাস অনেক ভারী। যত উঁচুতে ওঠা যায়, বাতাস তত হালকা হয়ে যেতে থাকে। সেইজন্যই কানে সমস্যা হয়, বুক ভরে শ্বাস নিলেও শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হতে থাকে।

পাতলা হতে হতে বাতাস এক সময় শেষ হয়ে যায়। সেখানেই মহাকাশের সূচনা।

বাতাসের এই পুরু চাদরটার নাম বায়ুমণ্ডল। ভূমি থেকে শুরু হয়ে আমাদের মাথার ওপর প্রায় দশ হাজার কিমি পর্যন্ত রয়েছে এই বায়ুমণ্ডল।

চরিত্র অনুসারে এই বায়ুমণ্ডলের পাঁচটা স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরেরই এমনকিছু উপযোগিতা আছে, যার জন্য পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, আমরা বেঁচে আছি।

নীচের ছকে সংক্ষেপে দেখে নাও, স্তরগুলো কীভাবে আমাদের রক্ষা করে।

ট্রপোস্ফিয়ার	উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে হওয়া বিকিরণ শুষে নিয়ে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়। এতে ভূপৃষ্ঠ জীবের পক্ষে আরামদায়ক থাকে।
স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার	সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে দেয় না এখানকার ওজোন নামক বিশেষ গ্যাসটি।
মেসোস্ফিয়ার	বড়ো উল্কাগুলি এখানেই বাতাসে ঘর্ষণের ফলে দ্রুত নরম হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নইলে সকলেই ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ত।
থার্মোস্ফিয়ার	রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়, ফলে আমরা রেডিও শুনতে পাই।
এক্সোস্ফিয়ার	কিছু মহাজাগতিক রশ্মি শোষণ করে নেয়। ফলে ক্ষতিকর ঐসব রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না।

একটু ভেবে লিখে ফেলো :

- চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। তাহলে—

  সেখানে জমিতে দাঁড়িয়ে আকাশটাকে কেমন দেখবে?

  সেখানে জমিতে পৃথিবীর থেকে বেশি উল্কাপাতের গর্ত থাকবে নাকি কম?

- কয়েকটা পর্বতচূড়ার নাম লেখো, যেখানে অভিযান করতে গেলে সাথে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিতে হবে। (বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে লেখো)

মাটি পাথরের জগত

পৃথিবীর চারভাগের প্রায় একভাগ অংশে মাটি-পাথর জেগে আছে। তাও আবার নানা স্থানে ছড়ানো। এদের বলে মহাদেশ। মাঝে রয়েছে বিরাট বিরাট সব মহাসাগর — জলে ভর্তি।

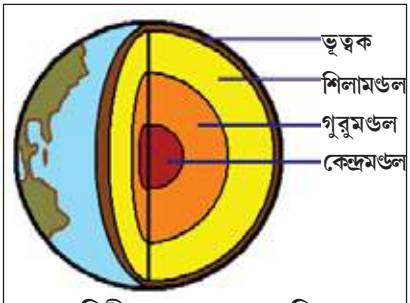

পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরবিন্যাস

মাটির কণা থেকে বড়ো বড়ো পাথর — সবাইকে একসাথে বলে শিলা। শিলা দিয়ে তৈরি পৃথিবীর অংশটার নাম **শিলামণ্ডল**। শিলামণ্ডলের একেবারে উপরের পাতলা ভূপৃষ্ঠকে **ভূত্বক** বলে।

শিলামণ্ডলের নীচেও রয়েছে খুবই ভারী অংশ। তাই এই অংশের নাম **গুরুমণ্ডল**। গুরু মানে হলো 'ভারী', তার থেকেও ভারী উপাদানে তৈরি পৃথিবীর একদম মাঝখানের বা ভিতরের অংশটার নাম **কেন্দ্রমণ্ডল**।

একটা সেদ্ধ ডিমের সাথে পৃথিবীর গঠনের খুব মিল। বাইরের শক্ত, কিন্তু পাতলা খোসাটা যেন শিলামণ্ডল, সাদা অংশটা যেন গুরুমণ্ডল আর ভিতরের হলদে কুসুমটা যেন কেন্দ্রমণ্ডল।

শিলামণ্ডল আমাদের কী কাজে লাগে?

বিভিন্ন পাথরে মিশে আছে নানা ধরনের ধাতু ও অধাতু — এগুলো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগে। এখান থেকেই আমরা খনিজ তেল ও কয়লা পাই — যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং গাড়ি চালানোর জ্বালানি মেলে। শরীর গঠনেও লাগে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতু। গাছ সেগুলো মাটি থেকে জলের সাথে শোষণ করে নিয়ে খাদ্যের চেহারা দেয়। উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীরাও সেই খাবার খেয়েই বেঁচে আছে।

শিলামণ্ডলের বড়ো আকারের সাতটা টুকরো পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো— অর্থাৎ মহাদেশের সংখ্যা এখন সাত। মাঝখানে ছড়িয়ে থাকা মহাসাগর পাঁচটি। চিরকাল কিন্তু এই সাতটাই মহাদেশ ছিল না, কিংবা ওই জায়গাগুলোতেই তারা জন্ম থেকে রয়েছে — এমনটাও নয়। পৃথিবীর জন্মের পর থেকে মহাদেশের টুকরোগুলো বারবার পুরো জোড়া লেগে যায় এবং তারপর নানা ভাগে ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। এইরকম অনবরত চলছে। এখনকার সাতটা টুকরো ভবিষ্যতে আবার কখনো জোড়া লেগে হয়তো একটাই সুবিশাল মহাদেশে পরিণত হবে।

মানচিত্রে বর্তমান পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো চিনে নাও

একটু ভেবে লিখে ফেলো

- বর্তমান মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর নামের তালিকা বানাও।
- পাশের ছবিতে দেখো প্রাচীন পৃথিবীতে মহাদেশগুলো সব একসাথে জোড়া লেগে আছে। মহাদেশের নামগুলো চিহ্নিত করো।

চারিদিকে জল

পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ অংশেই জল — মহাকাশ থেকে তাকে সেইজন্য নীল রঙের দেখায়। সৌরপরিবারে আর কোনো গ্রহে জল তরল অবস্থায় নেই।

সবথেকে বেশি জল আছে সমুদ্রে — লবণাক্ত অবস্থায়। বেশ খানিকটা জল বাতাসে জলীয় বাষ্প হিসেবে আর শীতল স্থানে বরফের রূপে রয়েছে। আর এই জলের খুব সামান্য অংশ মিষ্টি জলরূপে আছে নদীতে, পুকুরে, মাটির নীচে ও হিমবাহের মধ্যে।

পৃথিবীতে প্রথম থেকেই জল ছিল না। শীতল হওয়ার পর নানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে জল তৈরি হয়ে নীচু স্থানগুলো ভরে তৈরি হয়েছে মহাসাগর। সূর্যের তাপে বাষ্পীভবন পদ্ধতিতে জলীয় বাষ্প হয়ে জল উঠে যায় আকাশের দিকে। গাছের পাতা থেকে প্রস্বেদন প্রক্রিয়াতেও জলীয় বাষ্প বাতাসে যুক্ত হয়। সেখান থেকে ঘনীভবন পদ্ধতিতে তৈরি হয় মেঘ। তারপর অধঃক্ষেপণ হিসেবে বৃষ্টি বা তুষার হয়ে ঝরে পড়ে মহাদেশে। আবার নদীর মাধ্যমে কিছু জল ফিরে যায় মহাসাগরে। এই পুরো ঘটনাকেই বলে **জলচক্র**। পুরো গ্রহজুড়ে যে জলচক্র, তাই-ই হলো বারিমণ্ডল। সমুদ্রের জলেই প্রাচীন পৃথিবীতে একদিন প্রথম প্রাণ জেগে উঠেছিল। জলের সাথে প্রাণের সম্পর্ক তাই বড়ো গভীর। আজও যেকোনো ধরনের জীবের শরীরেরই বেশিরভাগ অংশের উপাদান জল। খাবার ছাড়া আমরা বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু জল ছাড়া দুদিনও বাঁচব না।

✸ **নীচের ছবিটিতে জলচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।**

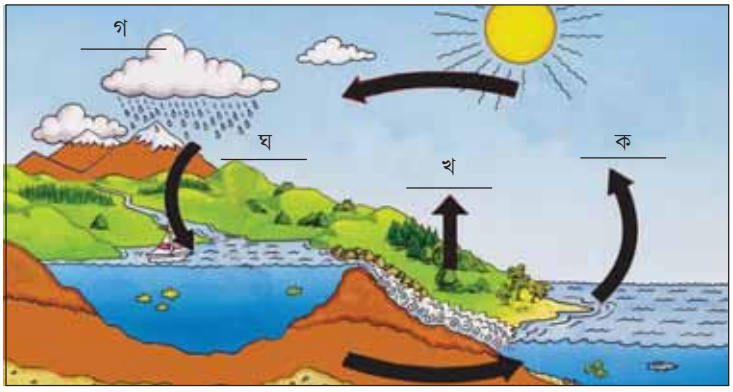

ক. .....

খ. .....

গ. .....

ঘ. .....

জলচক্র না থাকলে আমাদের জীবমণ্ডল সৃষ্টি হতো না— দলগত আলোচনার মাধ্যমে উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো।

✸ **দলে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।**

সারাদিনে তুমি কতটা জল ব্যবহার করো	
কী কী কাজে জলের ব্যবহার বেশি হয়	
জলের ব্যবহার কমাতে তুমি কী করতে পারো	

জীবজগত আর মানুষ

সাগরের জলে সামান্য কয়েকটা প্রাণ কণিকা দিয়ে যার সূচনা, প্রাণের সেই অভিযান আজ বারিমণ্ডল ছেড়ে শিলামণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় পনেরো লক্ষেরও বেশি আলাদা ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা চিনতে পেরেছেন। চিনতে বাকি বেশিরভাগ অংশ, চেনা অচেনা মিলিয়ে এই জীবজগতের আরেক নাম **জীববৈচিত্র্য**।

কিন্তু চিনবার আগেই তো মানুষের ক্ষতিকর কাজকর্মে পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে তারা। ওজোন গ্যাসের স্তর নষ্ট করে, পৃথিবীকে বেশি উত্তপ্ত করে ফেলে মানুষ নিজের ধ্বংস কি নিজেই ডেকে আনছে না?

মনে রাখা জরুরি :

- **বায়ুমণ্ডল** — ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার কিমি পর্যন্ত পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বাতাসের চাদর।
- **বারিমণ্ডল** — পৃথিবীর মোট জল, যা নানা চেহারায় নানাস্থানে সর্বদা চলমান।
- **শিলামণ্ডল** — মাটি-পাথরে তৈরি পৃথিবীর বাইরের কঠিন আবরণ।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'জল-স্থল-বাতাস' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল —

(ক) জলে (খ) ভূমিতে (গ) মাটির নীচে (ঘ) বাতাসে।

১.২ কোনো গ্রহে বাতাস না থাকলে সেখানে আকাশের রঙ হবে —

(ক) নীল (খ) ধূসর (গ) কালো (ঘ) সাদা।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ _____ গ্যাস স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয়।

২.১.২ পৃথিবীর একদম ভিতরে রয়েছে _____ মণ্ডল।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ মানুষের নানা কাজের জন্য বর্তমানে বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে না।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ	
২.৩.১	পর্বতরোহী	১.	এক্সোস্ফিয়ার
২.৩.২	বায়ুমণ্ডল	২.	অতিবেগুনি রশ্মির শোষণ
২.৩.৩	মহাদেশ	৩.	অক্সিজেন সিলিণ্ডার
২.৩.৪	ওজোন গ্যাস	৪.	শিলামণ্ডল

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নীচের স্তর কোনটি?

২.৪.২ পৃথিবীতে এখন কয়টি মহাসাগর আছে?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ আমরা রেডিওতে অনুষ্ঠান শুনতে পাই কেন?

৩.২ মানুষ কীভাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝো?

৪.২ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর কীভাবে আমাদের উপকার করে — ব্যাখ্যা করো।

5 আবহাওয়া-জলবায়ুর ভিত্তি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রত্যেকদিনের শুরুতে সচেতন বা অবচেতনভাবে একটি প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে যে আজকের দিনটা কেমন, বা কেমন থাকবে — অর্থাৎ দিনটা রোদ ঝলমলে, না মেঘলা, নাকি ভ্যাপসা, না মনোরম! সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের দৈনিক কার্যপ্রণালী ঠিক করি। সুতরাং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনেক সময় দেখা যায় প্রখর গ্রীষ্মে হঠাৎই একদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমে গেল। আবার পরের দিন তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সুতরাং, প্রতিদিন তাপমাত্রা একইরকম নাও থাকতে পারে, হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। বায়ুমণ্ডলের এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলে **আবহাওয়া**। কিন্তু আবহাওয়া নিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও তার একটা গড় অবস্থা থাকে। যেমন— গ্রীষ্মকালে হঠাৎ একদিন তাপমাত্রা কমলেও তা কখনোই এতটা নীচে নামতে পারেনা যে গরম জামা গায়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, গ্রীষ্মকালে সাধারণভাবে তাপমাত্রা বেশিই থাকে, শীতকালে তাপমাত্রা সাধারণভাবে কমই থাকে। সারা বছর শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু একইভাবে, একই সময়ে আসে-যায় এবং এই ধারা বছরের পর বছর চলতে থাকে। আবহাওয়ার এই দীর্ঘমেয়াদি (অন্তত ৩০-৩৫ বছর) বিন্যাস বা গড় অবস্থাকে **জলবায়ু** বলে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান

আবহাওয়া ও জলবায়ু যে বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলি হলো তাদের উপাদান। যেমন— বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, মেঘাচ্ছন্নতা ও অধঃক্ষেপণ। এগুলির মিলিত অবস্থা হল আবহাওয়া ও জলবায়ু।

বায়ুর উষ্ণতা ⇨ সূর্যের তাপে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় ও আমরা সেই তাপ অনুভব করতে পারি। বায়ুমণ্ডল কীভাবে উত্তপ্ত হয়? সূর্য থেকে আগত সৌররশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে, একে বলে **বিকিরণ**। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তর স্পর্শসংযোগের মাধ্যমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে বলে **পরিবহণ**। উত্তপ্ত বায়ু হালকা হয়ে উপরে ওঠে, ঠাণ্ডা ও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে ও আবার গরম ও হালকা হয়ে উপরে ওঠে। এইভাবে তাপের সঞ্চালনকে বলে **পরিচলন**। বায়ুর উষ্ণতা মাপার যন্ত্র হলো **থার্মোমিটার**।

বায়ুর তাপ সঞ্চালন পদ্ধতি

বায়ুর আর্দ্রতা ⇨ বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে সমুদ্র, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। বায়ুতে এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে আর্দ্রতা বেশি হয় বা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব বাড়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম হলে আর্দ্রতা কমে বা শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। বায়ুর আর্দ্রতা মাপা হয় **হাইগ্রোমিটার** নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

অধঃক্ষেপণ ⇨ জলীয় বাষ্প বায়ুতে উপস্থিত ধূলিকণার ওপর জলকণা রূপে জমা হয়। একে বলে **ঘনীভবন**। ভাসমান ধূলিকণার উপর জলকণা সৃষ্টি করে **মেঘ**, যার থেকে হয় **অধঃক্ষেপণ**। মেঘ থেকে অভিকর্ষের টানে জল বা বরফ যাই পড়ুক, তাই অধঃক্ষেপণের অন্তর্গত। জলরূপে পড়লে তা হলো বৃষ্টিপাত, বরফরূপে পড়লে তুষারপাত, আর জল ও বরফের কুচি একসাথে পড়লে তাকে বলে শিলাবৃষ্টি। বায়ুর উষ্ণতা বেশি হলে হয় বৃষ্টিপাত, আর বায়ুর উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকলে হয় তুষারপাত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয় **রেনগজ** নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

➢ **নীচের শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে ফাঁকা জায়গা পূরণ করো :**

[ ]
বিকিরণ
উত্তপ্ত করে
↓

ভূপৃষ্ঠকে
↓
যা উত্তপ্ত করে
↓
[ ]
পরিবহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
উচ্চ বায়ুস্তর
উত্তপ্ত হয়
[ ]
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

জলভাগকে
↓
যা উত্তপ্ত হয়ে
↓
[ ]
তৈরি হয়
↓
যা শীতল ধূলিকণাকে কেন্দ্র করে
[ ]
সৃষ্টি করে
↓
[ ]
যা থেকে হয়
[ ]

উষ্ণ আবহাওয়ায় হয়
↓
[ ]

অতি শীতল আবহাওয়ায় হয়
↓
[ ]

শব্দভাণ্ডার

সূর্যের, বায়ুমণ্ডলকে, পরিচলন, জলীয় বাষ্প, ঘনীভূত হয়ে, মেঘ, অধঃক্ষেপণ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত

বায়ুর চাপ ⇨ ভূপৃষ্ঠের ওপর বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় তাকে বলে বায়ুর চাপ। এই চাপ কমে যখন বায়ু উষ্ণ ও হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে, সেই অবস্থাকে বলে **নিম্নচাপ**। ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয় ও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে। এই নিম্নমুখী বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর পুনরায় চাপ দেয়, ফলে **উচ্চচাপ** সৃষ্টি হয়। বায়ুর চাপমাপক যন্ত্র হলো **ব্যারোমিটার**।

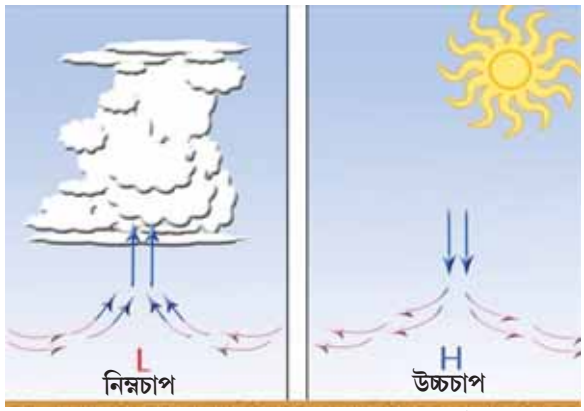

বায়ুপ্রবাহ ⇨ বায়ু প্রবাহিত হয় চাপের তারতম্যের জন্য। নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে সেই স্থান তুলনামূলকভাবে বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। চাপের পার্থক্য যত বাড়ে ততই বায়ুপ্রবাহের গতি বাড়ে, যা ক্রমে বিধ্বংসী ঝড়েও পরিণত হতে পারে। আমরা জানি, ২০০৯ সালে 'আয়লা', ২০২০-তে 'আমফান' ও ২০২১-এ 'ইয়াস' নামক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তা নির্ণয় করার জন্য **বাতপতাকা** ব্যবহার করা হয়। বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুযায়ী তার নামকরণ হয়। আবার বায়ুর গতি মাপা হয় **অ্যানিমোমিটার**-নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

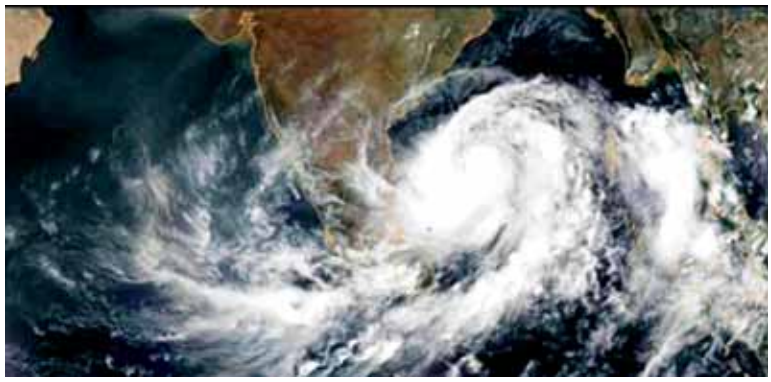

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস

➢ **নিম্নে প্রদত্ত ছবিটিতে বায়ুপ্রবাহ তিরচিহ্ন দিয়ে দেখাও ও বায়ুপ্রবাহের দিক উল্লেখ করো ।**

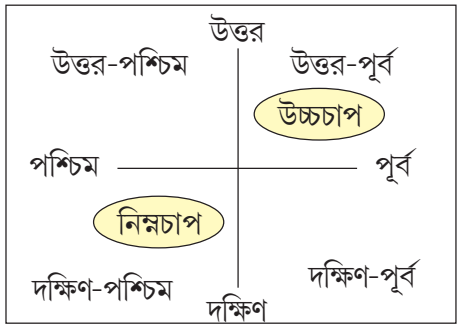

মনে রাখা জরুরি :

- **আবহাওয়া** — বায়ুমণ্ডলের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা।
- **জলবায়ু** — কোনো স্থানের অন্তত ৩০-৩৫ বছর ব্যাপী আবহাওয়ার গড় অবস্থা।
- **ঘনীভবন** — পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'আবহাওয়া ও জলবায়ু' অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ যে পদ্ধতিতে আগত সৌররশ্মি ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তা হলো—

(ক) বিকিরণ (খ) পরিবহন (গ) পরিচলন (ঘ) ঘনীভবন।

১.২ বায়ুর চাপ মাপা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে তা হলো—

(ক) হাইগ্রোমিটার (খ) থার্মোমিটার (গ) ব্যারোমিটার (ঘ) অ্যানিমোমিটার।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে যে গ্যাসীয় আবরণ তাকে বলে _____।

২.১.২ তুষারপাত এক প্রকার _____।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুযায়ী তার নামকরণ হয়।

২.২.২ উষ্ণতা বেশি হলে বায়ুমণ্ডলে সাধারণত নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ তাপমাত্রা	১. হাইগ্রোমিটার
২.৩.২ বৃষ্টিপাত	২. অ্যানিমোমিটার
২.৩.৩ আর্দ্রতা	৩. রেনগজ
২.৩.৪ বায়ুর গতিবেগ	৪. থার্মোমিটার

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ যখন কোনো স্থানে বায়ু কম চাপ দেয়, সেই অবস্থাকে কী বলে?

২.৪.২ কোন প্রক্রিয়ায় জল বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ বায়ুর আর্দ্রতা বলতে কী বোঝায়?

৩.২ ঘনীভবন কাকে বলে?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য কী?

৪.২ উদাহরণসহ অধঃক্ষেপণ কী তা ব্যাখ্যা করো।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ বায়ুমণ্ডল কী কী প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয় তা ব্যাখ্যা করো।

৫.২ বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

6 বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের সংক্ষিপ্ত ধারণা

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- দূষণের ধারণা লিখতে পারবে।
- কোন কোন উপাদানগুলি দূষণ সৃষ্টি করে তা উল্লেখ করতে পারবে।
- বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যখন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল তখন পরিবেশের উপাদানগুলি এমন এক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যাতে প্রাণের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবেশকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবশের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছিত উপাদান মিশছে, যা পরিবেশের স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে **পরিবেশ দূষণ**।

পরিবেশ দূষণ

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয় তা হলো **পরিবেশ**। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের যেসব জৈব ও অজৈব বা জড় বস্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে, তাই হলো **আমাদের পরিবেশ**।

পরিবেশের অন্যতম তিনটি উপাদান হলো বায়ু, জল ও মাটি। এই প্রত্যেকটি উপাদানের কিছু স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানুষের ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে।

কিন্তু এই উপাদানগুলির মধ্যে যখন এমন কিছু এসে মেশে যা বায়ু, জল বা মাটির স্বাভাবিক ধর্মকে নষ্ট করে দেয় এবং সেই অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তখন সৃষ্টি হয় **দূষণ**।

যেমন— তুমি রোজ যে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাও, সেই রাস্তায় যদি হঠাৎ করে কোনো গাড়ি থেকে প্রচুর কালো ধোঁয়া বেরোয় এবং বায়ুতে মিশে যায়, তাহলে দেখবে সেই বায়ুতে তুমি শ্বাস নিলে তোমার কষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ গাড়ির কালো ধোঁয়া বায়ুতে মিশে বায়ুর স্বাভাবিক ধর্মকে নষ্ট করে দিয়েছে, এবং সেই ধোঁয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করায় তোমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের বায়ু দূষিত হয়ে পড়েছে। যে উপাদানটি বায়ুতে মিশে বায়ুদূষণ সৃষ্টি করলো অর্থাৎ গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া, সেটি হলো **দূষক**।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, যখন বায়ুর মধ্যে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান মিশে বায়ুর স্বাভাবিক ধর্মকে নষ্ট করে দেয়, তখন তাকে বলা হয় **বায়ুদূষণ**।

যে সমস্ত অবাঞ্ছিত উপাদান বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে সেগুলিকে বায়ুদূষক বলে। অর্থাৎ বায়ুদূষকই হলো বায়ুদূষণের উৎস।

বায়ুদূষণের কারণ

- প্রাকৃতিক
  - দাবানল
  - অগ্ন্যুৎপাত
  - ধূলিঝড়
- মনুষ্যসৃষ্ট
  - শিল্পায়ন
  - যানবাহনের ধোঁয়া
  - নগরায়ন
  - কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক

বায়ুদূষণের প্রভাব

- মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব (শ্বাসকষ্ট, হাঁচি)
- বিশ্ব উষ্ণায়ন
- ধোঁয়াশা (ধোঁয়া + কুয়াশা)
- অ্যাসিড বৃষ্টি

শব্দদূষণ

তোমার স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ঘরটা হলো রাস্তার ধারে। যখন শিক্ষিকা-শিক্ষকরা তোমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তখন মাঝে মাঝেই রাস্তা দিয়ে জোরে হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি যায়। ফলে তোমাদের পড়াশোনায় অসুবিধা হয়। এছাড়া খুব জোরে কোনো আওয়াজ হলেও তা আমাদের কানে প্রবেশ করে মাঝে মাঝে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মাত্রার থেকে বেশি জোরে সৃষ্ট কোনো আওয়াজ আমাদের শারীরিক অসুস্থতা ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলো **শব্দদূষণ**।

শব্দের তীব্রতা মাপা হয় ডেসিবেল (db) এককে। বিজ্ঞানীদের মতে ৬৫ ডেসিবেল অবধি তীব্রতাযুক্ত শব্দ মানুষের কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না, কিন্তু কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা যখন ৬৫ ডেসিবেল অতিক্রম করে, তখন তা সৃষ্টি করে **শব্দদূষণ**।

শব্দদূষণের উৎস

- যানবাহনের শব্দ ও হর্ন
- লাউড স্পিকার
- কলকারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দ
- সাইরেন
- বজ্রের শব্দ

শব্দদূষণের প্রভাব

- মানুষের শোনার ক্ষমতা কমে যেতে পারে বা মানুষ বধিরও হয়ে যেতে পারে
- উচ্চ রক্তচাপ ও অনিদ্রা
- কাজে বিরক্তি

✸ **নীচের তালিকাতে তোমার বাড়ির আশেপাশের বায়ু ও শব্দদূষণের উৎসগুলি চিহ্নিত করে লেখো—**

বায়ুদূষণের উৎস	শব্দদূষণের উৎস
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

✸ **চার্টটি দেখে দলে আলোচনা করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

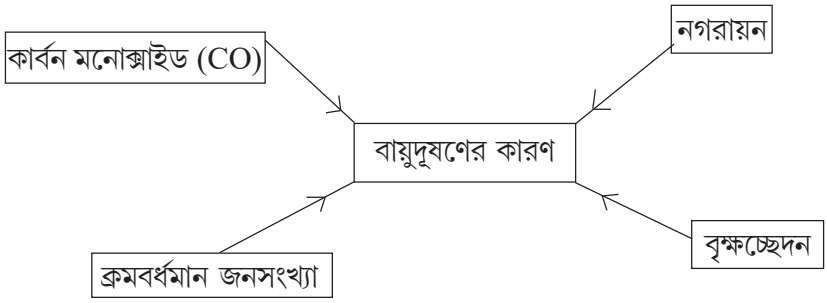

- বায়ুদূষণের কারণ হিসাবে ওপরের চারটি বিষয় কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত?
- তোমাদের আশেপাশে কোন কোন উৎস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড CO_2 নির্গত হয়?
- চার্টে উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া আর কোন কারণের জন্য বায়ুদূষণ ঘটে?
- ‘গ্রামের তুলনায় শহরের বায়ু বেশি দূষিত’ — বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

✷ **দলগতভাবে আলোচনা করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

- দিনের বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন ঋতুতে একই উৎসের শব্দের তীব্রতার মধ্যে কী তফাৎ ঘটে?
- উচ্চ ডেসিবেল শব্দের উৎসের কারণে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়?
- তোমার ঘরের ভেতরে উচ্চ ডেসিবেলযুক্ত শব্দযন্ত্র ব্যবহারের কুফল কী?
- বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান বা উৎসবে কোন ধরনের শব্দের উৎস বা শব্দযন্ত্রের ব্যবহারে সীমারেখা টানা উচিত ও কেন? বয়স্ক, শিশু বা অসুস্থ মানুষের জন্য শব্দদূষণ কতটা হানিকর সে বিষয়ে নিজস্ব মতামত দাও।

মনে রাখা জরুরি :

- **পরিবেশ** — আমাদের চারপাশের জৈব ও জড় উপাদানসমূহ, যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।
- **দূষণ** — প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো উপাদানের মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনো পদার্থের প্রবেশের ফলে সেই উপাদানের স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- **দূষক** — যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান দূষণ সৃষ্টি করে।
- **ডেসিবেল** — শব্দের তীব্রতা মাপার একক।

বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের উৎস ও প্রভাব সম্বন্ধে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণির 'বায়ুদূষণ' ও 'শব্দদূষণ' অধ্যায় দুটিতে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ শব্দের তীব্রতা মাপার একক হলো—

(ক) ডেসিবেল (খ) গ্রাম (গ) সেলসিয়াস (ঘ) মিটার।

১.২ বায়ুদূষণের একটি প্রাকৃতিক কারণ বা উৎস হলো—

(ক) যানবাহন (খ) শিল্প (গ) কৃষিকাজ (ঘ) দাবানল।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:**

২.১.১ একটি বায়ুদূষকের উদাহরণ হলো _____।

২.১.২ শব্দদূষণের ফলে সৃষ্ট একটি রোগ হলো _____।

২.২. **বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো:**

২.২.১ বায়ুদূষণের ফলে মানুষের শ্বাসকষ্ট হয়।

২.২.২ শব্দদূষণের প্রভাবে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে।

২.৩ **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :**

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
২.৩.১ শব্দদূষক	১. ডেসিবেল
২.৩.২ ধূলিঝড়	২. যানবাহনের হর্ন
২.৩.৩ শব্দের তীব্রতা মাপার একক	৩. বায়ুদূষণ

২.৪ **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :**

২.৪.১ শব্দদূষণের একটি প্রাকৃতিক উৎসের নাম লেখো।

২.৪.২ আমাদের পরিবেশের একটি জৈব উপাদানের নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ পরিবেশ বলতে কী বোঝো?

৩.২ শব্দদূষণের উৎসগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

৪. **নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :**

৪.১ মানুষের জীবনে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি ব্যাখ্যা করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো ঃ

১.১. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যে গ্যাস অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে —

(ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন (গ) হাইড্রোজেন (ঘ) ওজোন।

১.২ পৃথিবীতে মহাদেশের সংখ্যা —

(ক) পাঁচ (খ) ছয় (গ) সাত (ঘ) আট।

১.৩ পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা গ্যাসীয় আবরণকে বলে —

(ক) শিলামণ্ডল (খ) জীবমণ্ডল (গ) বারিমণ্ডল (ঘ) বায়ুমণ্ডল।

১.৪ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয় যে যন্ত্রের দ্বারা তা হলো —

(ক) থার্মোমিটার (খ) রেনগজ (গ) হাইগ্রোমিটার (ঘ) অ্যানিমোমিটার।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

২.১.১ বায়ুমণ্ডলের সবথেকে নীচের স্তর হল _____।

২.১.২ মাটির কণা থেকে বড়ো পাথর, সবাইকে একত্রে বলে _____।

২.১.৩ সৌররশ্মি পৃথিবীকে সরাসরি উত্তপ্ত করে _____ পদ্ধতিতে।

২.১.৪ বৃষ্টির সাথে বরফের কুচি পড়লে তাকে বলা হয় _____ বৃষ্টি।

২.২ বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ আয়নোস্ফিয়ারে রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

২.২.২ পৃথিবীর গভীরতম স্তরটি হল শিলামণ্ডল।

২.২.৩ কোনো স্থানে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলির দৈনিক অবস্থা হল সেই স্থানের জলবায়ু।

২.২.৪ উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়।

২.৩. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ রেডিও তরঙ্গ	১. পাথর
২.৩.২ বারিমণ্ডল	২. আয়নোস্ফিয়ার
২.৩.৩ ধাতু ও অধাতু	৩. জলচক্র

২.৪ **একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও** :

২.৪.১ সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোথায় প্রাণের বিকাশ ঘটে?

২.৪.২ ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ সবথেকে বেশি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের যে স্তর তার নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৩.১ পর্বতারোহীদের অক্সিজেন সিলিন্ডার দরকার হয় কেন?

৩.২ মানুষ কীভাবে পৃথিবীর পরিবেশ বিনষ্ট করছে?

৩.৩ অধঃক্ষেপণ কাকে বলে?

৩.৪ বায়ুর চাপ বলতে কী বোঝায়?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৪.১ বায়ুমণ্ডল নেই, এমন কোনো গ্রহে দিনেরবেলাও আকাশকে কেনো কালো দেখাবে?

৪.২ জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?

৪.৩ ঘনীভবন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দাও।

৪.৪ নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৫.১ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো।

৫.২ জলচক্রের একটি চিহ্নিত চিত্র এঁকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।

৫.৩ পরিবহন ও পরিচলন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করো।

7 ভারতের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতের অবস্থান, ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, মৃত্তিকা, অরণ্যপ্রাণ, কৃষিকাজ, বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে।
- ভারতের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি অনুধাবনের মাধ্যমে নিজের এলাকার সঙ্গে তুলনা করতে পারবে।
- ভারতের রেখা মানচিত্রে উপযুক্ত প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।
- স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।

একনজরে ভারতের সাধারণ পরিচয় :

পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল ও সপ্তম বৃহত্তম দেশ।

অক্ষাংশগত অবস্থান : ৮°০৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩৭°০৩′ উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত।

দ্রাঘিমাগত অবস্থান : ৬৮°০৭′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত।

গোলার্ধভিত্তিক : ভারত নিরক্ষরেখার (০°) উত্তরে ও মূলমধ্যরেখার (০°) পূর্বে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত।

ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করেছে ২৩°৩০′ উত্তর অক্ষরেখা যা কর্কটক্রান্তিরেখা নামে পরিচিত।

ভারতকে পূর্ব ও পশ্চিম দুভাগে ভাগ করেছে ৮২°৩০′পূর্ব দ্রাঘিমারেখা যা ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমারেখা হিসাবে পরিচিত।

➢ তোমাদের মধ্যে কাদের বাড়ির চারদিকে প্রাচীর বা বেড়া বা খাল বা নদী রয়েছে?

তোমরা কি জানো, আগেকার দিনে রাজা, জমিদার বা সামন্তদের বাড়ীর চারিদিকে হয় প্রাচীর নতুবা পরিখা কাটা থাকত ফলে বাইরে থেকে আসা শত্রুরা সহজে হঠাৎ করে দুর্গ বা প্রাসাদ আক্রমণ করতে পারত না।

প্রকৃতির আশীর্বাদস্বরূপ ভারতের উত্তরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সুবিশাল পর্বতশ্রেণির হিমালয়ের অবস্থান। আবার দক্ষিণ ভারতীয় ভূখণ্ডের তিনদিক জলবেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপীয় অবস্থান ভারতকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে যেমন রক্ষা করে তেমনি সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও মৎস্য সংগ্রহের সুবিধা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করেছে।

তোমাদের বাড়ির পাশে যাদের বাড়ি তাদের তোমরা প্রতিবেশী বলো। সেরকম ভারতের চারপাশে থাকা দেশগুলিই হলো ভারতের প্রতিবেশী দেশ।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি হলো উত্তরে বৃহত্তম জনবহুল দেশ চিন এবং সম্পূর্ণরূপে স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল ও ভুটান; উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান; পূর্বে মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণে সম্পূর্ণ জলবেষ্টিত দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। এছাড়া ভারতের উত্তরদিক বাদ দিয়ে বাকি তিনদিকেই সমুদ্র রয়েছে — দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর।

সুবিশাল ভারতের উত্তরে কাশ্মীরের ‘ইন্দিরা কল’ (উত্তরতম বিন্দু) থেকে দক্ষিণে ‘কুমারিকা অন্তরীপ’ (মূল-ভূখণ্ড) (যদিও দক্ষিণতম স্থান আন্দামান নিকোবরের ‘ইন্দিরা পয়েন্ট’) ৩২১৪ কিমি বিস্তৃত। আবার পশ্চিমতম স্থান গুজরাটের ‘ঘুয়ার মোটা’ থেকে পূর্বতম স্থান অরুণাচল প্রদেশের ‘কিবিথু’ পর্যন্ত ২৯৩৩ কিমি বিস্তৃত।

ভারত
রাজনৈতিক মানচিত্র
আফগানিস্তান
কাবুল
ইসলামাবাদ
জম্মু ও কাশ্মীর
লাদাখ
চীন
পাকিস্তান
হিমাচলপ্রদেশ
পাঞ্জাব
উত্তরাখণ্ড
হরিয়ানা
দিল্লী
নেপাল
তিব্বত
রাজস্থান
উত্তর প্রদেশ
সিকিম
থিম্পু
ভুটান
আসাম
মেঘালয়
মনিপুর
বিহার
বাংলাদেশ
ঢাকা
ত্রিপুরা
মিজোরাম
কর্কটক্রান্তি রেখা ২৩°½ উ
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
ঝাড়খণ্ড
পশ্চিমবঙ্গ
কলকাতা
ভারত
ছত্তিশগড়
মায়ানমার
উড়িষ্যা
ভুবনেশ্বর
মহারাষ্ট্র
আদিলাবাদ
নিজামাবাদ
করিমনগর
ওয়ারাঙ্গাল
তেলেঙ্গানা
হায়দ্রাবাদ
নালগোন্ডা
মেহবুবনগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
পানাজি
অন্ধ্র প্রদেশ
কর্ণাটক
চেন্নাই
পুদুচেরি
তামিল নাড়ু
কাঞ্জরাভি
তিরুবনন্তপুরম
শ্রীলঙ্কা
শ্রী জয়বর্ধনেপুরাকোট্টে
মালদ্বীপ
ভারত মহাসাগর
নির্দেশিকা
সীমানা :
আন্তর্জাতিক
রাজ্য
নাম-স্থান :
দেশের রাজধানী
দিল্লী
রাজ্য রাজধানী/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
বোঙ্গালুরু
জেলা সদর
হাওড়া
নদী
১৪০ কিমি. ০ ১৪০ ২৮০ ৪২০ কিমি.
১ : ১৪,০০০,০০০

সুবিশাল আয়তন, বিস্তৃতি, ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জলবায়ুগত বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সামাজিক ও মানবিক ঐক্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি কারণে ভারতকে উপমহাদেশ বলা চলে।

কালের স্রোতে ১৯৫০ সালে স্বাধীনোত্তর পর্বে নভেম্বর মাসে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন যে রাজ্য বিভাজন শুরু করেছিল তা ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে পুনরায় বিন্যস্ত হয়, এভাবে বিন্যস্ত হতে হতে বর্তমানে ভারতে ২৯টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ২২টি। সংযোগকারী ভাষা - ইংরেজী।

বিষয়ের ভিত্তি	**বৃহত্তম**	**ক্ষুদ্রতম**
রাজ্য	রাজস্থান	গোয়া
*জনসংখ্যা	উত্তরপ্রদেশ (প্রায় ২০ কোটি)	সিকিম (প্রায় ৬.৭০ লক্ষ)
*জনঘনত্ব	বিহার (১১০২/বর্গ কিমি)	অরুণাচল প্রদেশ (১৭ জন/বর্গ কিমি)
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	লাক্ষাদ্বীপ

* ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে

জেনে রাখো

- নবীনতম রাজ্য তেলেঙ্গানা, রাজধানী — হায়দ্রাবাদ।
- নবীনতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল — লাদাখ, রাজধানী — লে।

ভারত এক ঐতিহ্যবাহী দেশ। ভারতে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ নানা ধরনের স্থান রয়েছে।

ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বেড়াতে যেতে পছন্দ করো। তোমরা কী কখনো এটা ভেবে দেখেছো যে মানুষ কেন বেড়াতে চায়? আসলে বৈচিত্র্যময় ভারতে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সর্বদাই অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানার লক্ষ্যে, একঘেয়েমি কাটাতে ভ্রমণে উৎসাহী হয়। পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদ-নদী, পাহাড়-ঝর্ণা, সমুদ্র, অরণ্য, স্থাপত্য, ধর্মীয় স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র, ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতির বৈচিত্র্য পর্যটকরা দর্শন করে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। এসো এবার আমরা ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জেনে নিই—

ভারতের

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগসমূহ

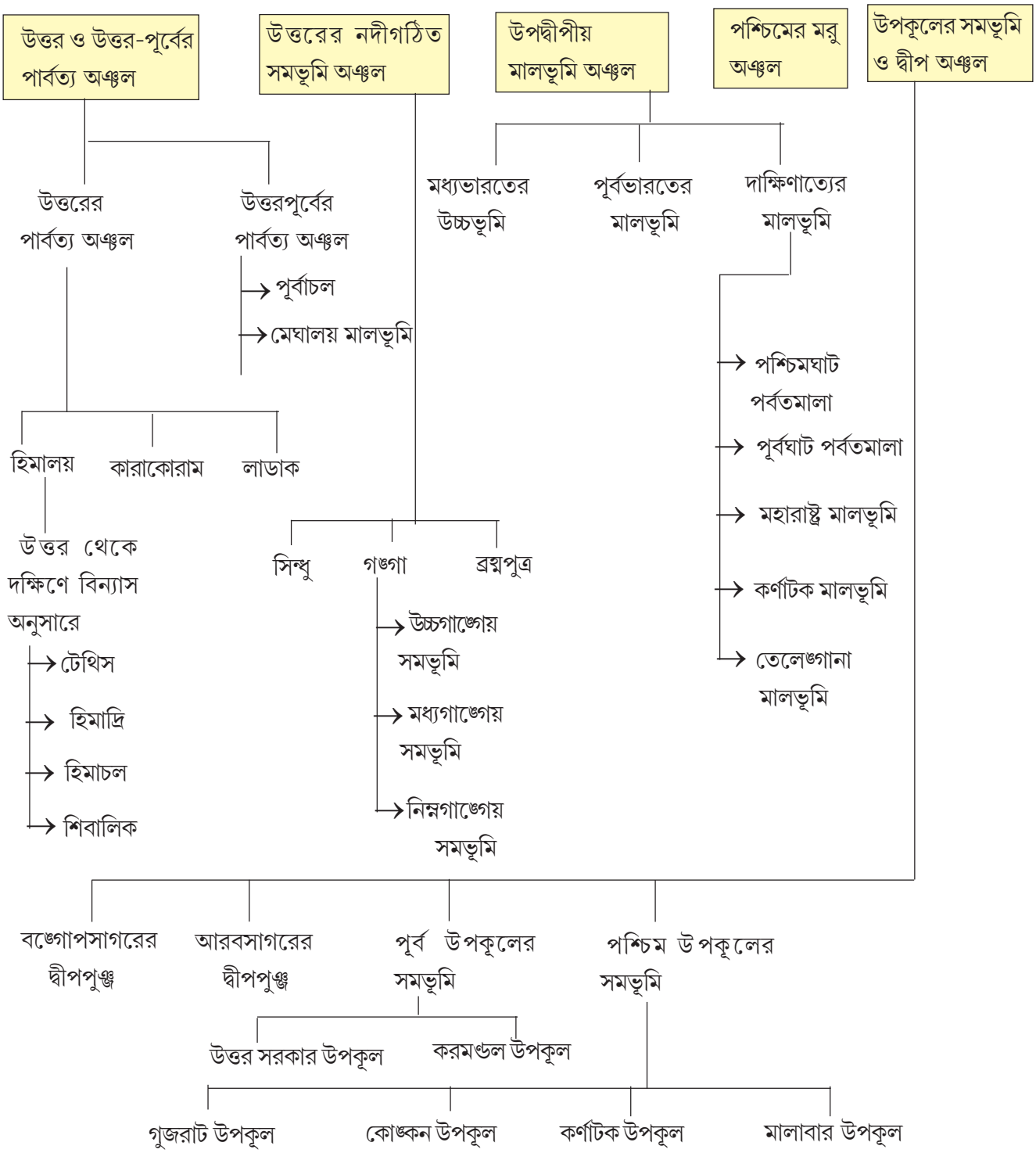

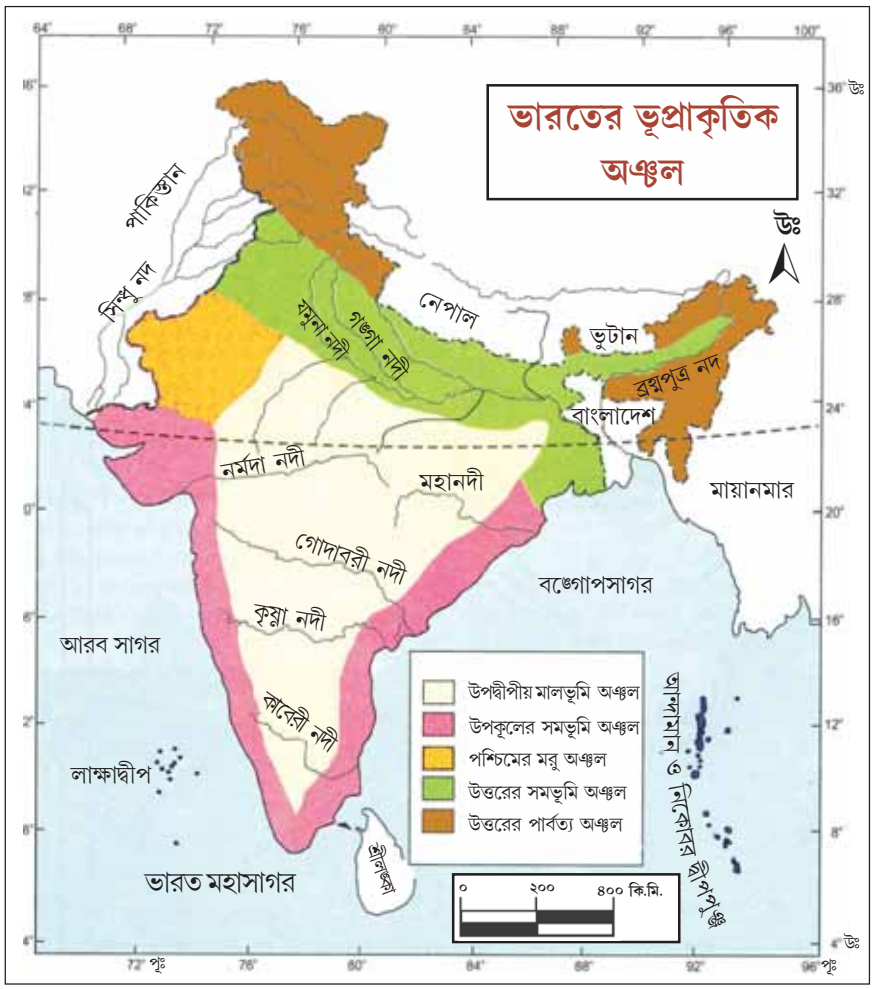

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

উত্তরে টেথিস থেকে দক্ষিণে শিবালিক পার্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের হিমালয় পর্বতমালা নবীন ভঙ্গিল পর্বত। এর মাউন্ট এভারেস্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

উত্তরের সমভূমি অঞ্চল ও নদী

সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বয়ে আনা পলি দিয়ে গঠিত এই সমভূমি। প্রাচীন পলিগঠিত সমভূমি হলো 'ভাঙ্গর' এবং নবীন পলিগঠিত সমভূমি হল 'খাদার'।

উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল

উত্তরের আরাবল্লী পর্বত থেকে শুরু করে দক্ষিণে আনাইমালাই ও পালনি পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল। এই মালভূমি অঞ্চলের পূর্বে রয়েছে পূর্বঘাট এবং পশ্চিমে রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বত।

পশ্চিমের মরু অঞ্চল

দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে ভারতের পশ্চিমে সৃষ্টি হয়েছে বৃহত্তম মুরভূমি। প্রায় গাছপালাহীন, বালি-প্রস্তরময় এই থর মরু অঞ্চল খুবই উষ্ণ প্রকৃতির।

উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপপুঞ্জ

ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিমে আরবসাগর সংলগ্ন সমভূমি হলো পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি। একইভাবে মানচিত্র লক্ষ করলে দেখবে পূর্বে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চল হলো পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি।

বঙ্গোপসাগরে ছোটো-বড়ো প্রায় ২৬৫টি আগ্নেয় দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়েছে। একইভাবে প্রায় ২৫টি ছোটো বড়ো দ্বীপ নিয়ে গঠিত প্রবাল দ্বীপ হলো লাক্ষা দ্বীপ।

বিশেষ কথা

চারিদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগ হল দ্বীপ। পাশাপাশি অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয় দ্বীপপুঞ্জ।

ভারতের নদী

ভারতের নদী মানচিত্রটি লক্ষ করে দেখো, বেশিরভাগ নদীগুলি পূর্ববাহিনী, আর কিছু সংখ্যক নদী পশ্চিমবাহিনী। উল্লেখযোগ্য পূর্ববাহিনী নদীগুলি হল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী আর পশ্চিমবাহিনী নদী হলো—নর্মদা ও তাপি। এক শ্রেণির নদী আছে যাদের উৎস ও মোহনা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এদের বলে অন্তর্বাহিনী নদী। যেমন — রাজস্থানের লুনি।

ভারতের জলবায়ু

কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানকার জলবায়ু অনুসারে আমাদের পোশাক নিয়ে যেতে হয়। সূর্যরশ্মির পতন কোণ, অক্ষাংশগত অবস্থান, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা, পর্বতের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় কোনো স্থানের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

- নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু লক্ষ করা যায়।
- সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু (দীঘা) আবার সমুদ্র থেকে দূরে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু (যেমন— দিল্লি) অনুভূত হয়।
- সমুদ্র থেকে দূরে মরু অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। যেমন - রাজস্থানের থর মরুভূমির জলবায়ু।
- পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমে বৃষ্টির প্রাচুর্য, আবার পূর্বে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বিরাজ করে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে ভারত ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ, মৌসুমি বায়ুর আগমনে ভারতে বর্ষা আসে আর প্রত্যাগমনের পর আসে শীত। ভারতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত মৌসুমি বায়ু দ্বারা সংঘটিত হয়। ভারতেই রয়েছে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান —মৌসিনরাম।

কিন্তু মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনা, অনিশ্চয়তা, স্থান ও কালভেদে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রঝড়সহ নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে যা ভারতের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান সবই মূলত মৌসুমি জলবায়ু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতের ঋতুবৈচিত্র্য

ঋতুর নাম	মাসের নাম	বিশেষত্ব
গ্রীষ্মকাল	মার্চ থেকে মে	উষ্ণ-আর্দ্র প্রকৃতির
বর্ষাকাল	জুন থেকে সেপ্টেম্বর	দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
শরৎকাল	অক্টোবর থেকে নভেম্বর	বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে এবং রোদঝলমলে পরিষ্কার আবহাওয়া বিরাজ করে।
শীতকাল	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী	উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতকাল প্রায় শুষ্ক।

ভারতের মৃত্তিকা

তোমাদের মধ্যে কে কে নিজের হাতে গাছ লাগিয়েছো? ফল খেতে, ফুলের বাগান দেখতে সবাইতো ভালোবাসো। কিন্তু তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি গাছগুলো কোথা থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে? মাটি গাছকে তার খাদ্যের জোগান দেয়।

মাটি হলো ভূপৃষ্ঠের পাতলা আবরণ, যা চূর্ণবিচূর্ণ শিলাজাত পদার্থ, যেগুলি জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশে গিয়ে জল ও বায়ুর সংস্পর্শে তৈরি হয়। মাটি সময়ের সাথে সাথে পরিণত হয়। উদ্ভিদকে সোজাভাবে দাঁড়াতে ও বৃদ্ধির অনুকূল পুষ্টিমৌলের জোগান দেয় মাটি।

তোমরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় কৃষিজমি, বসতজমি, রাস্তা, খালের পাড় এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে মৃত্তিকার রঙ, দানার প্রকৃতি, ক্ষয় প্রবণতা সবই আলাদা আলাদা রকমের।

- তাইতো সুবিশাল ভারতে স্থানভেদে বহুরকম মাটি দেখা যায়—

যেমন— পলিমাটি, কালোমাটি বা রেগুর, লালমাটি, ল্যাটেরাইট মাটি, মরু অঞ্চলের মাটি, পার্বত্য অঞ্চলের মাটি প্রভৃতি।

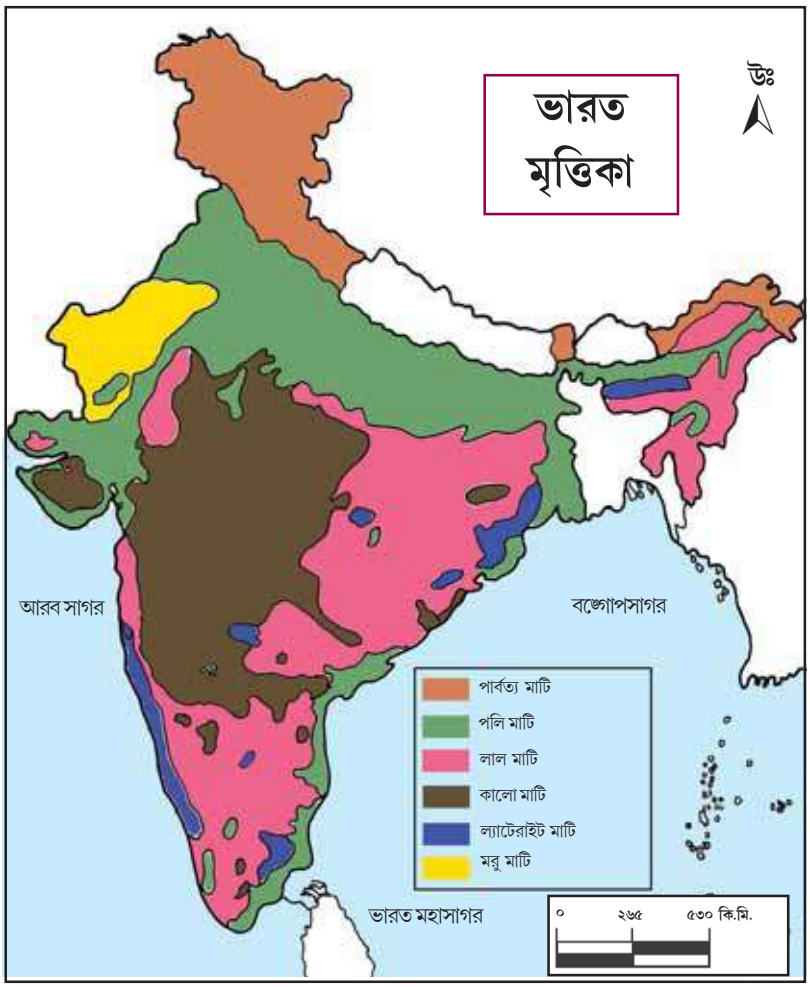

➢ মাটি কৃষিকাজ, জীবের আবাসস্থল, পশুচারণ, কুটির শিল্প, গৃহনির্মাণের উপকরণ, প্রতিমা তৈরী, রাস্তা ও বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

➢ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, অত্যধিক বায়ুপ্রবাহ (ঝড়), বৃক্ষচ্ছেদন, মানবিক কার্যকলাপের ফলে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও মাটির গুণমান হ্রাস পায়।

➢ মাটির উর্বরতা শক্তি বজায় রাখার জন্য বৃক্ষচ্ছেদন, সুগভীর অংশের ভৌমজল ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন বন্ধ করা উচিত। এছাড়াও ধাপচাষ ও ঝুমচাষ বন্ধকরা, নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ করা, বৃক্ষরোপণ করা, ঢালযুক্ত অংশে পরিবহন ও জনবসতির বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

তোমরা সবাই মানোতো যে গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু। তাহলে আমরা বলতে পারি — ‘‘একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান।’’

➢ ভারতের কাশ্মীর (প্রধানত সরলবর্গীয়) থেকে কন্যাকুমারিকা (প্রধানত ক্রান্তীয় চিরহরিৎ), আবার থর মরুভূমি (প্রধানত ক্যাকটাস) থেকে সুন্দরবন (প্রধানত ম্যানগ্রোভ) সর্বত্র নানা ধরনের উদ্ভিদের সমাহার লক্ষ করা যায়।

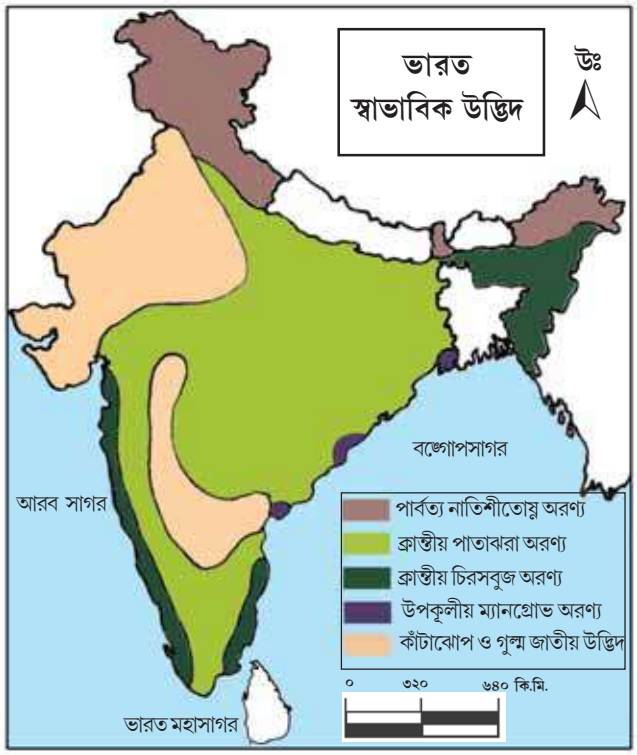

মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রকৃতির (মাটি ও জলবায়ু) সাহচর্যে বেড়ে ওঠে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এই মাটির চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। কৃষক যখন নিজের প্রয়োজনে কৃষি জমির চারধারে আল বরাবর গাছ লাগান, পরিচর্যা করেন তখন তাকে কৃষি বনসৃজন বলে।

সমাজের সার্বিক মঙ্গল সাধনের জন্য পতিত স্থান, রাস্তা, খাল, নদীর দুপাশে সরকার কর্তৃক সমাজের দায়িত্বে বনসৃজন করলে তাকে সামাজিক বনসৃজন বলে। এক্ষেত্রে—আকাশমনি, বাবুল, ইউক্যালিপটাস, শাল, সেগুন জাতীয় গাছ লাগানো হয়। ভারতে প্রাচীনকাল থেকে নানা ধরনের ওষধি উদ্ভিদের ব্যবহার চলে আসছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এই সকল উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়।

জেনে রাখো

৫ই জুন যেমন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়, তেমনি বিশ্ব অরণ্য দিবস ২১শে মার্চ পালিত হয়।

✸ **নিম্নে প্রদত্ত সারণির শূন্যস্থান পূরণ করো। দলে আলোচনা করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এবং সারণিতে উল্লিখিত দুটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।**

রাজ্য	ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল	ভূমির ঢাল	মৃত্তিকা	জলবায়ু	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড	_____	_____	_____	শীতল বা অতিশীতল	নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য
পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ	উত্তরের নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চল	কম	পলিগঠিত উর্বর	_____	_____

- দক্ষিণ ভারত উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত কিন্তু সেখানেই উটিতে সারাবছরই ঠান্ডা থাকে কেন?

✷ **তোমরা বাড়ির আশেপাশে থাকা উপকারী গাছের পাতা সংগ্রহ করে একটি খাতায় (হার্বেরিয়াম শিট) আঠা দিয়ে বসিয়ে পাতাটির নাম, তার প্রাপ্তিস্থান ও উপকারিতা সম্পর্কে দু-এক কথা লিখে ফেলো।**

অরন্য ও বন্যপ্রাণ

তোমরা নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয় পশু বা জাতীয় পাখির নাম জানো। আমাদের জাতীয় পশু হলো বাঘ এবং জাতীয় পাখি হলো ময়ূর।

যেসব প্রাণী স্বাধীনভাবে প্রকৃতিতে জীবনযাপন করে তাদের বন্যপ্রাণী বলে। এরা গৃহপালিত নয়। যেমন - রাজস্থানের মরু অঞ্চলের উট, গুজরাটের গির অরণ্যের সিংহ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের ভালুক, রেড পান্ডা ইত্যাদি। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ সালে চালু হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ ''বন্যপ্রাণ সপ্তাহ'' রূপে পালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভের শিকার হচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। তাই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে নানা ধরনের আইন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ণ করা হয়েছে।

যে সকল প্রাণী পৃথিবী থেকে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইন সিটু (নিজ বাসস্থানে) সংরক্ষণ ও এক্স সিটু (নিজের বাসস্থান থেকে বাইরে) সরক্ষণ পদ্ধতিতে জীব সংরক্ষণ করা হয়।

✷ **একনজরে ভারতের অরণ্য ও বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা —**

তুলনার বিষয়	সংরক্ষিত অরণ্য Reserved Forest	সুরক্ষিত অরণ্য Protected Forest	অভয়ারণ্য Sanctuary	জাতীয় উদ্যান National Park
পরিচয়	এই অরণ্যে শিকার, পশুচারণ নিষিদ্ধ	এই অরণ্যে, অরণ্য নির্ভর মানুষদের শিকার ও পশুচারণের সুযোগ দেওয়া হয়	এই অরণ্যে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীদের সুরক্ষা প্রাধান্য পায়	এই অরণ্যে বণ্যপ্রাণীর সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়
নিয়ন্ত্রণ	কেন্দ্র সরকার	কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়	রাজ্য সরকার	কেন্দ্র সরকার
সীমারেখা	নির্ধারিত	১৯২৭সালের আইন দ্বারা	নির্দিষ্ট নয়	আইন দ্বারা নির্ধারিত
কঠোরতা	প্রবেশে অনুমতি লাগে	অনুমতি লাগে না	অনুমতি প্রয়োজন	প্রবেশ অবারিত
উদাহরণ	কোডার্মা (ঝাড়খন্ড)	সাতপুরা ন্যাশানাল পার্ক (মধ্যপ্রদেশ)	জলদাপাড়া (পশ্চিমবঙ্গ)	কাজিরাঙা (অসম)

ভারতের কৃষিকাজ

আমরা জানি ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় ৬৫% জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে মানুষ নদী তীরে বনভূমি পুড়িয়ে ঝুমচাষ করতো। পরে নিবিড় জীবিকাসত্তা ভিত্তিক কৃষি পদ্ধতি সাফল্য পায়। ষাটের দশকের শেষ দিকে সবুজ বিপ্লবের জনক স্বামীনাথন প্রস্তাবিত উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার জলসেচ, কৃষি যন্ত্রীকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, সরকারি আনুকূল্য ভারতকে খাদ্যশস্য (মূলত গম) উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে সাহায্য করেছিল।

ভারতের প্রধান কৃষিজ ফসলগুলি হলো — ধান, গম, মিলেট, আলু, পটল, তুলো, পাট, চা, কফি, ডাল, আখ, তৈলবীজ ইত্যাদি।

মনে রেখো

বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে যে শস্য চাষ করা হয় তাকে বলে খারিফ শস্য। যেমন— ধান, পাট।
শীতকালে মূলত জলসেচের উপর নির্ভর করে চাষ করা শস্যকে বলে রবিশস্য। যেমন—তৈলবীজ, গম।

✸ **সমীক্ষার বিষয়—তোমার দেখা কোন একটি কৃষি অঞ্চল সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ পত্র**

বিদ্যালয়ের নাম ————————————

তোমার নাম ————————————, ক্রমিকসংখ্যা ————————

সমীক্ষিত এলাকার নাম ————————————, তারিখ ————————

সমীক্ষার জন্য রাখা কয়েকটি প্রশ্ন	**প্রাপ্ত তথ্য/উত্তর**
(i) কৃষিজমির প্রকৃতি ও উর্বরতা কেমন ?	
(ii) উৎপাদিত ফসলের নামগুলি কী কী?	
(iii) উন্নতা কীরূপ?	
(iv) মৃত্তিকার প্রকৃতি কীরকম?	
(v) জলসেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা কেমন?	
(vi) মূলধন, সার ও কীটনাশক লাগে কিনা?	
(vii) উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রয় ও গুদাম জাতকরণের সুবিধা কিরূপ?	
(viii) কৃষক বা 'কৃষিশ্রমিক' লাভবান হয় কি?	
(ix) সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় কি?	
(x) ভারতের কোথায় কোথায় এই ধরনের কৃষিকাজ লক্ষ করা যায়?	

ভারতের জনজাতি ও অধিবাসী

তোমরা জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় মন দিয়ে গানের কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করেছ কি? যদি তা অনুধাবন করতে পারো তাহলে ভারত ও ভারতবাসীদের সম্পর্কে তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে।

ভারতের আদিম অধিবাসীরা এখনও অরণ্য ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতে পছন্দ করে। যেমন— কিন্নর, ভিল, গোন্ড (বৃহত্তম আদিবাসী), সাঁওতাল, চেঞ্চু, টোডা, গারো, খাসি, কোল, মুন্ডা, জারোয়া প্রভৃতি। এরা শিকার, ফলমূল সংগ্রহ ও কৃষির মাধ্যমে জীবন-যাপন করে।

ভারতে যারাই বসবাস করেন তারাই ভারতীয় অধিবাসী। রাজ্য ও স্থান ভেদে প্রত্যেকের ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রধান উৎসব আলাদা আলাদা। কিন্তু এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমরা ঐক্য অনুভব করি।

মনে রাখা জরুরি :

- **গিরিপথ** — দুটি পর্বতের মাঝে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সংকীর্ণ পথ।
- **খারিফশস্য** — বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে চাষ করা শস্য।
- **রবিশস্য** — শীতকালের মূলত জলসেচ নির্ভর শস্য।

তোমরা এই বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির 'আমাদের দেশ ভারত' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ ভারত এশিয়া মহাদেশের যে দিকে অবস্থিত তা হলো —

(ক) উত্তর (খ) দক্ষিণ (গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম।

১.২ ভারতের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত একটি নদী হলো —

(ক) গঙ্গা (খ) গোদাবরী (গ) নর্মদা (ঘ) কৃষ্ণা।

১.৩ পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল হলো —

(ক) বেঙ্গালুরু (খ) সিমলা (গ) মৌসিনরাম (ঘ) দিল্লী।

১.৪ জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে যে ফসল চাষের তেমন ক্ষতি হয় না তা হলো —

(ক) ধান (খ) গম (গ) চা (ঘ) কার্পাস।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

২.১. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ ভারত ও শ্রীলঙ্কা ———— প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

২.১.২ কালোমাটির অপর নাম হলো ————।

২.১.৩ সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জলাভূমিতে ———— উদ্ভিদ জন্মায়।

২.১.৪ ভারতের একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম হলো ————।

২.২ বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ ভারতের পশ্চিমে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

২.২.২ গ্রীষ্মকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

২.২.৩ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানত সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়।

২.২.৪ রাজস্থানে থর মরুভূমি একশৃঙ্গ গণ্ডারের প্রাকৃতিক আবাস।

২.৩ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১ বৃক্ষচ্ছেদন	১. সুন্দরবন
২.৩.২ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু	২. মাটির ক্ষয়কে বাড়িয়ে দেয়
২.৩.৩ ম্যানগ্রোভ	৩. গোদাবরী
২.৩.৪ পূর্ববাহিনী নদী	৪. বর্ষাকাল

২.৪ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৪.১ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কী ধরনের জলবায়ু দেখা যায়?

২.৪.২ বিশ্ব অরণ্য দিবস কবে পালিত হয়?

২.৪.৩ ভারতের একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালার নাম লেখো।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ উপহ্রদ কাকে বলে?

৩.২ খারিফ শস্য কাকে বলে?

৩.৩ অরণ্য সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

৩.৪ 'আদিবাসী' কাদের বলা হয়?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৪.১ ভারতকে কেন উপমহাদেশ বলা হয়?

৪.২ ভারতীয় জলবায়ুর তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪.৩ অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৪.৪ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ ভারতের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও পশ্চিমের মরু অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫.২ ভারতের ঋতুবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫.৩ অরণ্য ছেদনের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

৬. ভারতের রেখামানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীকসহ চিহ্নিত করো :

পশ্চিমের মরু অঞ্চল

গঙ্গা নদী

পার্বত্য অঞ্চলের মাটি

কন্যাকুমারিকা

বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশ

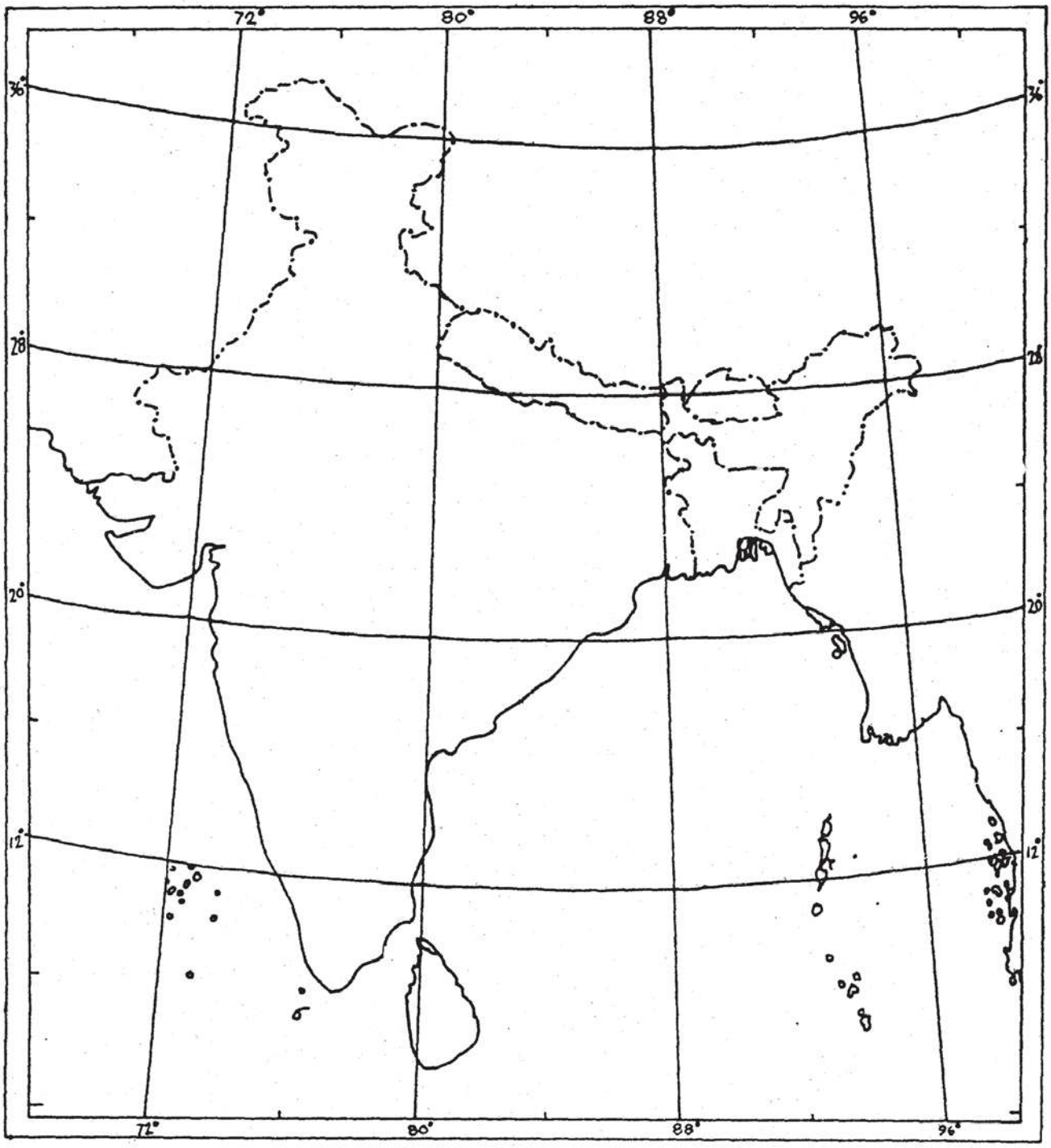
72°
80°
88°
96°
36°
28°
20°
12°

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬